অর্ধশতাব্দী

॥ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশপূর্তিতে স্মারকগ্রন্থ

॥ সম্পাদনা ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ঃ কলিকাতা ৯ ॥

প্রথম সংস্করণ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭
৮ই মে ১৯৬০

॥ প্রচ্ছদপট ॥
সত্যজিৎ রায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত।

।। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত ।।

শতাব্দীকে অর্ধশতাব্দী

এখনো ঝড়ের সিংহ-চেতনার অগ্নিকেশরে
সূর্য চমকায় প্রখর নখরে
সবুজ খোঁপায় মাদরি আগুনে
এখনো বৈশাখী মেঘের আগুনে
কখনো অবসাদে কখনো কাঁদিতে
আত্মসমাহিত স্বপ্নরাশিতে
কখনো গুরুগুরু দুন্দুভি মালকোষে কখনো রিমঝিম ভৈরবী বেদনায়
এখনো ঝড়ের হৃদয় চমকায় অতীত চেতনায়।

নওল-নয়নার অঞ্চলে অনুরাগ
নেচেছে তালে তালে খেয়ালী নূপুর
ছয়টি ঋতু এসে ষড়ৈশ্বর্যে
কাননে মর্মর জলদে বজ্রে
দুলেছে শতরোল সোহাগী হিন্দোল স্বপ্ন উতরোল বিজলী নয়নার।
তবুও ছায়াপথে জীবনের বৈভবে
মধুর হে সুদূর, কোথায় বই নাও?
ডেকেছি বারবার দিশারী আলোকের শাশ্বত কোনো সাড়া!

আমরা মাটি ছুঁয়ে করেছি অনুভব শোষিত মানুষের ক্লান্ত মাথা-নাড়া।
শুনেছি মাটি থেকে অনাদি ক্রন্দন
যন্ত্রে প্রগতির অমিত মন মন
মুঠিতে দশদিক ধরেছি কৌশলে বেঁধেছি শৃঙ্খলে স্থাবর জঙ্গম।
পবন এখন সভয় বন্ধু
আকাশ-সচেতন সূর্য নম্র
অগ্নি চন্দ্রমা যন্ত্র শাসনে যম সভয় মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অর্ধশতকের সিংহ-চেতনার
অগ্নি-কেশরে অতীত বেদনার
প্রগতি-সাধনার মন্ত্রে মনোময় হে প্রেম রবিময়, তোমায় নমো নমঃ।

১১ই মার্চ ১৯৬০
কলকাতা

বিমল চন্দ্র ঘোষ

[কবির হস্তাক্ষর]

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দ, সাহিত্যানুরাগী সমাজ এবং অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা কবিকে মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্বর্ধনা জানান। সভায় নেতৃত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে কবিকে মানপত্র দেন কলকাতার পৌরপ্রধান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন মনীষী এই সভায় কবির প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাষণদান করেন। দেশের প্রায় সমস্ত শক্তিমান নবীন কবি কবিতাপাঠের দ্বারা তাঁদের অগ্রজ কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে এমন ব্যাপক এবং বিপুল কবি-সম্বর্ধনার রূপ আর প্রত্যক্ষ করা যায় নি। কবি বিমলচন্দ্র জনগণের চিত্তে কী গভীর প্রীতি ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছেন মহাবোধি সোসাইটি হলের এই ভাবগম্ভীর উৎসবটিই তার প্রমাণ।

'অর্ধশতাব্দী' এই সম্বর্ধনা-উৎসবেরই স্মারক। সাতচল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন কবি (এঁদের মধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের দু'জন হিন্দী কবিও আছেন) এই উপলক্ষে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে বিমলচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁদের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছেন। বিমলচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কয়েকটি নতুন লেখা এই গ্রন্থের মূল্যবান আকর্ষণ। এ ছাড়া বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম তরুণ লেখক পর্যন্ত বিমলচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে যে সমস্ত অভিমত ও আলোচনা নানা সময়ে, নানাভাবে করেছেন, সেগুলিও এই স্মারকগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আশা করি, বিমলচন্দ্রের কাব্য-সাধনার স্বরূপ ও সাফল্যের পরিচিতি এই আলোচনাগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলাকাব্যের (১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) একটি সামগ্রিক রূপও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য যে সব কর্মীবৃন্দ এই সংকলন প্রকাশের পথ সুগম ক'রে দিয়েছেন তাঁদের সকলকে ও প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ-পটটির জন্য শ্রীঅনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

কলকাতা
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সূচীপত্র

॥ কবিতা ॥

॥ প্রবন্ধ ॥

॥ কবিতা ॥

॥ বিবিধ প্রসঙ্গ ॥

॥ কবির প্রতিকৃতি ॥



পঞ্চাশপূর্তিতে বিমলচন্দ্র

কবি বিমলচন্দ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পারে নাই এই বিপুল পৃথিবী
মিটাতে তোমার ক্ষুধা,
তুমি অতৃপ্ত চকোর যে কবি
চাহ অসীমের সুধা।

গরুড় পাখীর পাখার বাতাস
মিটাক তোমার আশ
ফিরে পাও তব সবল পক্ষ
উজ্জ্বল নীলাকাশ।

শিব সুন্দর সত্যের হের
নূতন আবির্ভাব
একই জন্মে কর তুমি কর
পুনর্জন্ম লাভ।

কোগ্রাম
২৭শে ফাল্গুন ১৩৬৬

প্রিয়চিকীর্ষা

রাধারাণী দেবী : নরেন্দ্র দেব

নব ফাল্গুনের বসন্ত প্রভাত।
সেই আনন্দ ঊষায়
এসেছিল একদিন আমাদের কুটীরে
একটি কিশোর কবি।
হাসির নির্মল আলোয় উদ্ভাসিত মুখ
প্রাণপ্রাচুর্যে সতেজ সুন্দর তনুদেহ;
আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মন,
হাতে ছিল রচনার পাণ্ডুলিপি।
সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছিলাম তাকে
শোনাও বন্ধু তোমার ছন্দগান।

দ্বিধাজড়তাহীন সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠে
মুক্ত ক'রে দিলে সে তার মন্দাকিনীধারা।
বিস্ময়ে আনন্দে অভিনন্দন জানালেম তাকে
আমরা দু'জনে মিলে।

তারপর......তারপর আবো বহুবার এসেছে সে.
মেলে ধরেছে নব নব বিচিত্র সৃষ্টি।
বহু সন্ধ্যা মাঝরাতে গড়িয়ে পড়েছে,
দিনের প্রথম প্রহর পৌঁছেচে চতুর্থ প্রহরে।
প্রতিবারই প্রত্যক্ষ করেছি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,
উৎসাহ দিয়েছি অকুণ্ঠ প্রশংসায়।

আমাদের অকপট স্নেহ হয়তো তৃপ্তি দিয়েছিল তাকে,
ভালোবেসেছিল সে আমাদের।
আসতো প্রসন্নমুখে ফিরে ফিরে;
কাব্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে
শোনাতো জীবনের নানা সজলকরুণকাহিনী,
কখনো মর্মান্তিক, কখনো বা রোমাঞ্চকর।
সেই বেদনাহত কঠিন দুঃখ-শিলার আড়ালে
সন্ধান পেয়েছিলাম তার উৎসধারার
সত্যের মতো সরল,
আগুনের মতো দীপ্ত।

দিন যায়।
গেল কত মাস, কত বৎসর।
ভেসে এল পৃথিবীর বুকে কত যুগান্তকারী পরিবর্তন।
কালস্রোতে উঠলো উত্তাল তরঙ্গ,
বিশ্বযুদ্ধ-বিপ্লব-বন্যা-মহামারী-মন্বন্তরে
বিধ্বস্ত হয়ে গেল অনেক কিছু!
পুরাতন দুর্গপ্রাচীর,
অতীতের অচলায়তন
ভেঙে পড়তে শুরু হ'ল চারিদিকে!

নতুন করে দেখা দিল সত্য-জিজ্ঞাসা
বদ্‌লে গেল সমাজের মূল্যমান
বদলে গেল আদর্শ,
সনাতনের ঘটলো সমাধি।
বিগতদিনেব রুচি হ'যে এল ঐতিহ্যের বিকৃত স্বপ্ন যেন!
মানুষেব চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে
দেখা দিল আমূল পরিবর্তন।
সেই ভাঙাগডাব দুর্বার স্রোতে
ঝাঁপিয়ে পড়লো বাংলার উদ্ধত যৌবন।

যৌবন-অতিক্রান্ত আমাদের কিশোর কবিকেও দেখলেম সেদিন
চলেছেন সেই প্রগতির তালে দৃপ্ত পা ফেলে।
সর্বহাবাদের মর্মভেদী হাহাকার
কবিব অন্তরে দিযেছে প্রচন্ড আগুনেব স্পর্শ
বলিষ্ঠ কণ্ঠে ফুটে উঠেছে বঞ্চিতদের ন্যায্য দাবী।
বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেম
কবির সেই অদ্ভুত পরিবর্তন!

গীতা-ভাগবত-বেদ-বেদান্তকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল
মার্ক্সের সংহিতা,
সমবেদনাতুব কবি এসে দাঁড়ালেন
দুঃখী মানুষগুলির পাশে,
তুলে নিলেন তাদের বুকের রক্তে রাঙা
শ্রমধর্মাক্ত পতাকা
নিজের শালপ্রাংশু হাতের শক্ত মুঠিতে।

প্রৌঢ়ত্ব এসেছে কবির দেহে
কিন্তু হরণ করতে পারেনি সে তার মনের যৌবনকে,
জয় হোক এই কবিচন্দ্রের কলঙ্কলাঞ্ছিত কালজয়ী বিমল-প্রতিভা!

অগ্নি-জ্বালা

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ করকমলেষু]

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হাতে তুলে নিয়েছিলে শিবের ডম্বরু,
বাঁশি নয়, পিনাকের বজ্রাগ্নি নির্ঘোষ
তোমার উদাত্ত কণ্ঠে; রৌদ্রতপ্ত মরু,
সেথা মগ্ন-সাধনায় তোমার সন্তোষ।

কালবৈশাখীর দিনে, এলোমেলো ঝড়ে
উড়াইয়া দিলে তব গৈরিক উত্তরী,
বিদ্যুতে বিদীর্ণ মেঘ ভাঙে আর গড়ে
তোমার জীবন চলে আঁধার সন্তরি'।

সে আঁধার দিয়ে গেল অমেয় আলোক
সে আঁধারে ধীরে ধীরে পথের নির্দেশ
জাগিল সম্মুখে তব; আত্মার নির্মোক
মুহূর্তে ভাঙিয়া গেল,—পেলে নির্বিশেষ

আপনার পরিচয়,—কবি, তুমি কবি,
তোমার নির্মল সত্তা আনন্দে বিলীন।
উদ্বেল সমুদ্র তার অন্তরের ছবি
তোমার অন্তরে নহে বেদনাবিহীন।

বিস্ময়ে অবাক তুমি, বাহিরে তোমার
নিঃস্বতার বেদীমূলে কত আত্মদান
প্রমূর্ত সুন্দরে লীন বিশ্ববাসনার
রূপে রসে পরিতৃপ্তি, ব্যাপ্তিতে অম্লান।

সে বাসনা সুরে সুরে তোমার বাঁশিতে
মূর্ছনায় অবগাঢ় আকাশে বাতাসে,
নব বসন্তের দিন আসিতে আসিতে
ফিরিয়া যায়নি কভু ব্যর্থ হতাশ্বাসে।

তোমার বৈরাগ্য নিয়ে প্রেয়সী তোমার
স্মিতহাস্যে রচিয়াছে কুসুম শয়ন
সন্ধ্যাদীপ প্রতিদিন শুভকামনার
জ্বালিয়াছে অকম্পিত, আনত নয়ন।

তবু যে ভুলেছ পথ বিভ্রান্ত আঁধারে
দুঃসহ সংঘাতে কভু করেছ বিদ্রোহ
জানি জানি অন্তর্গূঢ় সেই বেদনারে,
এও জানি কত তুচ্ছ সে ক্ষণ দুর্মোহ।

নূতন দিগন্তে পেলে অনন্তের দেখা
সূর্যালোকে উদ্ভাসিত অসীম আকাশ
সে আকাশে অস্তরবি আঁকে রক্তলেখা
মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিরুদ্ধ বাতাস।

জীবনের অপরাহ্নে মহৎ প্রকাশ
তারই তরে সাধনার বিচিত্র প্রস্তুতি,
শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাহি অবকাশ
পঞ্চাশের পদক্ষেপে এ নহেক স্তুতি।

জ্যেষ্ঠের এ আশীর্বাদ, সতীর্থের প্রীতি
অন্তরে রাখুক তব দৃপ্ত অগ্নিজ্বালা
সে জ্বালায় পরিশুদ্ধ নিত্য নব গীতি
গাঁথিয়া তুলিবে অভিনন্দনের মালা।

হে কবি তোমার জয়!

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

হে কবি বিমল ঘোষ!
চারিদিকে এত ঘৃণা রোষ,
তারি মাঝে জন্মদিনে
পঞ্চাশের যৌবনের বীণে
ঝঙ্কার তুলেছ অগ্নিময়
হে কবি তোমার জয়॥

আমি যেন পুরাতন বীণা
কবিরূপে নাহি যায় চিনা
তবু তব সম্মানের বাণী
আনন্দের ভাষা দেখ আনি
ছিন্ন তারে বাজাইনু সুর
তোমার জীবন হোক শিল্পরসে নন্দিত মধুর!

যুগান্তর দপ্তর
১২. ১২. ১৯৫৭

শব্দী

অন্নদাশঙ্কর রায়

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে তাঁর অর্ধশতাব্দীপূর্তি উপলক্ষে]

জব্দিবে কে শব্দীকে?
শব্দ যে যায় সব দিকে।
যতই আসুক দুঃসময়
শব্দ যে যায় বিশ্বময়।

যতই ঘটুক ভোগান্তি
শব্দ যে যায় যুগান্তে।

স্তব্ধ করো শব্দীকে
শব্দ যাবে সব দিকে
আর
পার হবে শতাব্দীকে।

॥ ৪ঠা মার্চ ১৯৬০ ॥

বিমলচন্দ্রকে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশেতে গ্রাস লেগেছে, চাইছ কি তাই ধরতে বুড়ী!
ব্লাডপ্রেশারেও হার মানোনি এ-ও কি কম বাহাদুরী!
প্রেমের কাজল পরলে চোখে অমৃত-রস ঝরবে প্রাণে,
সাল-শতকের ভুলবে হিসেব বাতাস ভরে রইবে গানে।

জয়তু

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়*

কর্মযোগের ঘর্ম-ঝরানো সৃজনীশ্রমের ধৃতি
বিশ্বদৃষ্টি ভাববাদী মায়া ভেদের তীক্ষ্ন শর
বিজ্ঞানমুখী বিদগ্ধ মন বাস্তব অনুভূতি
মর্ত্যের মাটি মমতার রসসিঞ্চনে উর্বর
লক্ষ বক্ষ উদ্বেল-করা শৃংখলভাঙা গীতি
ঘোষিছে জগন্নাথের রথের অবিরাম ঘর্ঘর
ষটচক্রের পাকে পাকে চলা অমোঘ অগ্রগতি।

* শ্রীভাঁওতা, সোভিয়েট দুনিয়া, বোলকলা, হাঙ্গেরী, বিপ্লবের সন্ধানে প্রভৃতির লেখক।

উজ্জীবনের স্বপ্নসদ্য চক্ষে

বিষ্ণু দে

উজ্জীবনের স্বপ্নসদ্য চক্ষে
কদম্বঘন রোমাঞ্চকর স্নেহে
জাগবে না তুমি চন্দ্রাপীড়ের বক্ষে?
অচ্ছোদ মনে অনচ্ছ নব দেহে
সুন্দরী তুমি সত্যেরই শুভ স্বপ্ন।

পূর্ণিমা-ভোরে আবার উষসী নগ্ন।
তোমাতে দেখেছি মানবিক কেন দৈবও।
কেন বা তূর্ণ আত্মা আদিম জৈবও,
তোমাতেই পীন হিমগিরি দুটি উপমা।
কেন বা নয়নে নক্ষত্রেবা লগ্ন,
ভঙ্গিলপেশী ভূগোল তোমাতে মগ্ন,

বাস্তবে আর মনসিজে চিরদ্বৈতে
অচ্যুত তুমি মানবমনের দয়িতা,
তোমার আলোকে কটাল দ্বন্দ্ব বইতে
কিবা আনন্দে গেয়েছি, গেয়েছি চেতনার সংহিতা,
নন্দনে তুমি চন্দ্ররচিত স্বপ্ন।

উদয়াস্তের সূর্যে তোমাতে বিবাদী চক্ষুকর্ণ
অথচ তোমাকে প্রত্যক্ষেই দেখা যায়,
প্রত্যহ তুমি মূর্ত প্রকৃতি মুখরিত সত্তায়,
তুমি যে সত্য সে কথা বুঝেছি রক্তে সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রিয়ময় মননে অস্থিমজ্জায়,

অথচ তোমার হাতে দশমিক পলাশে সদ্য হিরণ্য
আমার হৃদয়, জরা-যৌবনে, নবান্নে কিবা চৈতে,
কিংবা আষাঢ়ে ঝুলন আশার পুলকে
কামনা যখন বৈদেহী ওড়ে দ্যুলোকে।

জানি তুমি স্বীয় স্বভাবে দোদুল প্রিয়া,
মেদিনীরই তুমি অগোচর আইডিয়া।
উভয়ত তুমি সেতুবন্ধনে চিরবনবাসী স্বপ্ন—
সনাতন এক অবাক শাখায় মিলিত দুই সুপর্ণ।

তাই ক্ষোভ নেই নেই অকালের অনুতাপ,
কারণ তোমার বাস্তবতাই যেন দৈনিক অন্ন,
তদু নাত্যেতি কশ্চন
বুভুক্ষু দেশে জীবনের মূল সত্যে।

চির অধরার আধার তোমাতে বাকি সব অভিশাপ,
বাকি সব কিছু ব্যবসার লোভী পণ্য
জঘন্য বর্বর।

তুমি শাশ্বতী বরাঙ্গ প্রাণে ভাস্বর
পবমান তুমি পূর্ণিমা দেহী মর্ত্যে,
জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় তুমি কোজাগর,
তোমার রাত্রে তীর্থযাত্রী করেছ সূর্যাবর্তে,
সুন্দরী তুমি প্রাকৃতিক প্রেমে মানসে ভোরাই স্বপ্ন॥

উদাত্ত ভারতের কবিকে

কনক মুখোপাধ্যায়

তোমাকে সৃষ্টি করেছে মাটি
মাটির বেদনা তোমার বুকে
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় করেছ পান
মাটির মানুষের গ্লানিময় জীবনের
যন্ত্রণার বিষম অমৃত।

তুমি তো দেখেছ জীবনশিল্পী,
প্রশান্ত সাগরের বুকে কত জ্বালা
মায়াভরা আকাশের চোখে কত জল
আর অসূর্যম্পশ্যার হৃদয়ের অতলে
জ্বলন্ত সূর্যের কী দ্যুতি!

তোমাকে অর্ঘ পাঠাই বন্ধু,
সূর্যমুখীর না-ফুটতে-পারার
বেদনার অমিত সম্ভারে।

প্রহরী-মরাল

মনীষা চক্রবর্তী

চ্যুত নক্ষত্রের মতো মৃত্যুনীল স্বপ্নের হাত ধ'রে
তুমি তো চাওনি কোনো তামস্বর শান্তির আড়াল,
রক্তের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ ধর্মের কান্তিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ব্যর্থতায় ভরে দিতে পৃথিবীর দিকচক্রবাল॥

নির্জন আরণ্যসাধ আত্মরত নির্বাক ব্যথায়
জনতাকে মৌন রেখে নির্বাসিত হওনি তো দূরে,
ফসিলের মূক কান্না শুনে তুমি প্রমত্ত আশ্বাসে
দিয়েছ আলোর স্বপ্ন ক্লিষ্ট সব পাখীদের সুরে।

গূঢ় এক গাঢ় প্রেম বহন করেছ তাই প্রাণে
জীবন পেয়েছ ছুঁতে অবিরাম হৃদয়ের টানে।

কবির পঞ্চাশে

আশা দেবী

হে কবি, জীবনতরী এলো আজ পঞ্চাশের পার
পাড়ি দিয়ে কত রাত্রি, ফেনোচ্ছল তুফানের জল,
রক্তস্নাত কত তট—কত ঘাট—কঙ্কালীতলার
যেখানে ডাকিনী-মন্ত্র জপ করে পিশাচের দল।
অতন্দ্র সাধনা বুকে চোখে জ্বলে আশা অনির্বাণ
মহাভারতীর তীর্থে স্থির লক্ষ্যে ধরে রাখ হাল
যত দুঃখ তব দীপ্ত দুঃসাহসী মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ
তুমি চলো—সাথে সাথে বজ্রহাতে চলে মহাকাল॥

চেয়ে দ্যাখো—'হিন্দুকুশ-হিমালয়-কারাকোরামে'র
'ত্রিমুণ্ড তুষারশৃঙ্গে' যুগান্তের রক্তদীপ দোলে
কালে কালে যত প্রাণ বলি হ'লো 'পঞ্চ-নিষাদের'
এবার জেগেছে তারা দুর্নিবার জীবন কল্লোলে।
তোমার দুর্জয় শক্তি চিরোজ্জ্বল অম্লান আশ্বাস
স্বীকৃতি-স্বাক্ষরে তার নবপত্র খোলে ইতিহাস॥

জন্মেজয়

[বিমলচন্দ্র ঘোষের জন্মদিনে]

সৈয়দ আবুল হুদা

অন্যায়ের সাথে লিপ্ত নিত্য তুমি কঠিন সংগ্রামে,
নির্ভীক নিঃশঙ্কচিত্ত স্পষ্টবাদী ঊর্ধ্বে তুলে শির—
তোমার বিদ্রূপবিদ্ধ সামাজিক গণ্ডারের চামে
শিরায় নিদ্রিত রক্তে গুঞ্জরণ কালবৈশাখীর।

লাঞ্ছিত বঞ্চিত ঘৃণ্য নিত্যযারা তিক্ত অপমানে,
অর্থলোভী কসায়ের পদাঘাতে করে আর্তনাদ—
তাদের সে অপমান অনুভব করো নিজ প্রাণে,
দাঁড়িয়ে তাদের পাশে করো তুমি নির্মম জেহাদ।

গোত্র-বংশ-শ্রেণী-জাতি নানারূপ কৌশলের বাধা
দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম রুদ্ধগতি সর্পিল বন্ধনে
পরীক্ষিৎ সর্পাহত—তক্ষকের মৃত্যুমন্ত্রে সাধা
জন্মেজয়! সর্পযজ্ঞ ছেড়ো নাকো ইন্দ্রের ক্রন্দনে।

'সম্মানের উচ্চাসনে নির্বাসন' করোনাকো আশা—
গুণহীন শিমুলের রক্তবর্ণ শুধু ভালবাসা।

সূর্যের সংকেত

[বিমলদা-কে]

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আলোর কণিকা তুমি,
তবু সূর্যতৃষ্ণা জাগে দু'চোখে তোমার!
অন্ধকার গুহাতলে অমর সাধনা :
প্রত্যূষ নবীন--আনুক অমর আলো!
খুশি হোক, প্রাণ হোক!

তুমি যে অক্ষয় প্রাণ,
সেই প্রাণ-কণিকায় সূর্যের সংকেত
তুমি যে দীপ্তির দাহে গান জ্বালো,
তুমি যে সাধক শ্রেষ্ঠ, আলো চাও, খুশি চাও
প্রাণে প্রাণে আনন্দ-উদ্বেল হ'য়ে-ওঠার যাদুতে
তুমি যে অম্লান হতে জানো
একটি অমর গান লিখে।
একটি অম্লান প্রাণ জ্বেলে!

তোমাকে আমার নমস্কার।

শতায়ুর্ভব

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ পূর্তিতে]

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

উজ্জ্বল রৌদ্রের আশমানী নীলে
একঝাঁক পায়রাকে ওড়ালে,
একদল শব্দের ঝাঁপতাল মিলে
উদাসী বাতাসটাকে ভরালে॥

আকাশকে ছুঁয়ে-যাওয়া এক-তূণ তীর
বলাকার ঝাঁক তা'রা নয়,
গোষ্ঠে ধেনুর মতো তারা গোধূলির
গূহগত ধ্যানে তন্ময়॥

পায়রার বোলে ঘর গুহম্ গুহম্
উদাত্ত ভারতের গান।
সে গান ধরেছ যদি, তবে তা স্বয়ং
গেয়ে যাও শতায়ু প্রমাণ॥

নাবিক

[বিমলদার ৫০তম জন্মদিনে]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কারে বেশী ভালবাসি, জীবন না ক্লান্তির শয়ন
মৃত্যুর ঘুমের মতো মনোহর রাত্রি না দিবাকে?
আমি প্রশ্নে ঘূর্ণমান অন্ধ আত্মা, অসুস্থ। যখন
দিন আসে, রাত্রি চাই; সারা নিশি রৌদ্রের বৈশাখে
পাখীর প্রেমের মতো শরীর রাঙাবো ব'লে জাগি :
ভুলের শিকার আমি, অসম্ভবমাত্রে অনুরাগী॥

অথচ তোমাকে দেখি অচঞ্চল নাবিকের মতো
কেমন বিশ্বাসী ধ্রুবতারা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে
দীপ্যমান, হিরণ্ময়। এমন কি রাত্রির আহত
আত্মা যদি খোঁড়া পায়ে পিছে থাকে, রৌদ্রের প্রস্তরে
লেখো তুমি এক নাম, দেখো তুমি দিনের অসুখে
সব তারা জ্বলে নেভে একটিরও মৃত্যু নেই মুখে॥
তেমন বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে যদি জন্মাতাম?
সে স্বপ্ন তোমার জন্মদিনে রেখে, জানাই প্রণাম॥

কবিবরেষু

[বিমলচন্দ্র ঘোষ-এর উদ্দেশে]

সুশীলকুমার গুপ্ত

কবিতাকে ভালবেসে—তার সঙ্গে সৃষ্টির লীলায়
স্বার্থসুখ ছুঁড়ে ফেলে একমুঠো ধুলোর মতন
যারা এই পৃথিবীব সর্বহারা স্বপ্নবাগিচায়
ফোটায় গোলাপ—জানি, তুমি তো তাদেরই একজন!

তোমার কাব্যের বুকে ঢেউ তোলে উদাত্ত ভারত,
তবু তুমি পথ হাঁটো বিশ্বব্যাপী ব্যথার মিছিলে;
আণবিক বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হ'লেও শপথ—
তুমি জান—অগ্রগতি অব্যাহত মিলিত নিখিলে।

দগ্ধদীর্ণ প্রাণবৃন্তে তুমি জ্বালো শান্তি অনির্বাণ
কবিতার কিশলয়ে, প্রেমের বিচিত্র কথকতা
শোনাও কপোতকণ্ঠে দ্বিপ্রহরে, দৃপ্ত মানবতা
কখনও ঝড়কে ঠেলে হানো ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ-কৃপাণ।
তোমার নিবিড় কবিকণ্ঠে বাজে অজেয় প্রত্যয়,
তাইতো তোমাকে দীপ্ত রক্তরাখি পরায় হৃদয়।

যুগোত্তীর্ণ কবি বিমলচন্দ্র

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

তৃতীয় নয়নে আর কিছুই দেখি না
কলার বিলাস অলংকার,
কেবল সামনে দেখি ধ'রে আছে ফণা
বজ্রমুষ্টি হাজার হাজার।

চোখের বলয়ে ক্ষুব্ধ রক্তরাঙা জ্যোতি
ক্রোধের বারুদে জ্বলে নীল।
নীল-বিদ্রোহের সব ফেরারী সেঁজুতি
প্রলয়ের সাজায় মিছিল।

বিক্ষুব্ধ কানেতে আর কিছুই শুনি না,
জনসমুদ্রের শব্দ শুনি,
আবহ সংগীতে রুদ্র কবিতার বীণা
ভাবোল্লাসে গায় আগমনী।

প্রহরে প্রহরে আজ এই উত্তেজনা,
কবি আছো আমার হৃদয়ে।
তোমার কবিতা দিলে বজ্রের প্রহার
জয়ী হবো জনতার জয়ে।

কালজয়ী

[ভক্তিভাজন কবি বিমলচন্দ্রকে]

বিভূদান রায়চৌধুরী

কত ফুলই জন্ম নেয় উদ্যানে ও উপবনে মৃত্তিকার সুধা ক'রে পান
ফুল তা'রা সকলেই। সকলেই নয় কিন্তু রক্তরাঙা প্রেমের গোলাপ
সূর্যস্পর্শ চেতনায় মখমল পাপড়িতে যার সুরভিত বিচিত্র আঘ্রাণ
লাবণ্য-মদির স্বপ্নে শুনেও শোনে না স্তুতি ভ্রমরের প্রগল্‌ভ প্রলাপ॥

তাইতো আড়ালে রাখে সৌরভ সম্পদ ঢাকে সচেতন কাঁটার পোষাকে
মৃত্তিকার রূপমায়া তাকে ঘিরে সর্বদাই তফাৎ করেছে অন্য ফুলে,
যে রসিক তা'র ভক্ত তা'রি প্রেমে অনুরক্ত মুগ্ধ হ'য়ে খুঁজে ফেরে তা'কে
অনুরাগী কাছে পেলে সে যেন জীবন পায় মমতার রাঙা পাপড়ি খুলে॥

তোমার জীবন কবি তারই স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি অনুরাগে অরুণসঙ্কাশ
সূর্যতেজে তেজস্বান প্রতিভায় অভিরাম তুমি যেন প্রস্ফুট গোলাপ,
সর্বমোহমুক্ত মন রক্তরাঙা হে যৌবন, নও তুচ্ছ পাঁজীর পঞ্চাশ
পক্ষ মাস বর্ষ দিয়ে হয় না, হয় না কবি, প্রতিভার কোনো পরিমাপ॥

তোমার পঞ্চাশপূর্তি পূর্ণতার প্রতিমূর্তি তাই আজ জানাই প্রণাম,
'উদাত্ত ভারত'-কবি 'রক্তগোলাপে'র বুকে তোমার যে কালজয়ী নাম!

একখানি চিঠি

কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
প্রীতিভাজনেষু

আপনার বয়স পঞ্চাশ বছর পুরো হয়েছে। এই উপলক্ষে দেশের কবি, শিল্পী, সাহিত্যেক ও সুধীবৃন্দ আপনাকে অভিনন্দিত করতে যাচ্ছেন জানতে পেয়ে আমি বড় খুশী হয়েছি। ছোটবেলায় ইরাণের মহাকবি সাআদীর কিছু কিছু কবিতা আমি পড়েছিলাম। চর্চার অভাবে এখন প্রায় সবই ভুলে গেছি। তবু মাঝে মাঝে তার দু'চার ছত্র এখনও মনে আছে। কবি এক জায়গায় লিখেছেন :

> "একদিন এক স্নানাগারে সুবাসসিঞ্চিত একদলা মাটি,
> কোনো বন্ধুর হাত হতে এলো আমার হাতে। মাটিকে
> জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি মৃগনাভি, না, আবীর?
> তোমার সুগন্ধে আমার মন যে উতলা হয়ে উঠল।
> মাটি জওয়াব দিল,—আমি তো হীন মাটিই,
> তবে কিছুকাল আমি ফুলের সহবাসে ছিলাম।"

আমার অবস্থাও এই রকম। আমি কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক নয়। তবে, অতীতে তাঁদের অনেকের সঙ্গলাভ করেছি, এখনও তাঁদের সংশ্রবে আসলে আনন্দ পাই। তাঁরা নন্দিত হলে আমারও আনন্দ হয়।

বড় বড় কবিদের কবিতা যে আমি বুঝি তা'ও নয়। তবুও কবিতা আমি মাঝে মাঝে পড়ি। কারণ, তা'র একটা বড় রকমের আকর্ষণ আছে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে আমি বোধ হয় তাল রেখে চলতে পারি নি। আমাদের আধুনিক কবিদের কবিতা তাই আমি যেমন বুঝি না, তেমনই তার দ্বারা আকর্ষিতও হই না। আজকালকার অনেক গল্প ও উপন্যাসের ভিতরেও আমি সহজে কোনও কাহিনী খুজে পাই না। কেবল কথার ছড়াছড়ি। লেখকেরা শুধু কথার জাল বুনে যান। আমার মতো অরসিক লোকদের নিকটে সে সব হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য কবিতা। মনকে অত্যন্ত সংহত করতে না পারলে আজ-কালকার বহু গল্প ও উপন্যাস পড়তে পারা যায় না। এই সব পড়ে সুধী-মন্ডলীর নিশ্চয় চিত্ত-বিনোদিত হয়, কিন্তু আমাদের মতো লোকের তাতে অবসর বিনোদিত হয় না।

আপনার কবিতা আমি পড়ি, কিন্তু আপনার সব কবিতা পড়েছি এ কথা বলে আমি ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে চাই না। আপনার কবিতা আমার নিকটে ধোঁয়া নয়, আমি তাতে মাটির মানুষের সঙ্গে সংযোগ খুজে পাই। আপনার কবি-মন শুধু আকাশে বিচরণ করে না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা তাতে সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আপনার মনকে নাড়া দেয়। আপনি দেশপ্রেমিক, কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্বারা আপনি কখনও আচ্ছন্ন হন না। এইজন্য আপনার কবিতার সুরে আমি আকর্ষিত হই। আমি জানি আপনার কবিতার বিরূপ সমালোচনাও হয়,—কাগজে-কলমে না হতে পারে, তবে কোনও কোনও বৈঠকে-আড্ডায় হয়। কেবল বিদগ্ধ-সমাজের জন্য

লেখেন না বলে কেউ কেউ বলেন আপনি কবিই নন, একজন পদ্যকার মাত্র। আজ এই মত আর টিকছে না।

আজ সর্বস্তরের সুধীমণ্ডলী মেনে নিচ্ছেন যে আপনি আমাদের দেশের একজন মহান কবি। এইরূপ স্বীকৃতিলাভ কবি ও লেখকদের জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আন্তর্জাতিক জগতেও আপনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। ইউ-রোপের অন্তত তিনটি দেশের ভাষায় আপনার কিছু কিছু কবিতা অনূদিত হয়েছে। আমি আনন্দিত যে আমাদের দেশের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সুধীদের নিকট হতেও আজ আপনি স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এটা অবশ্য একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। দেশের নিকট হতেও প্রকৃত স্বীকৃতি আপনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন। দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আপনার কবিতা পড়েন। আপনার কাব্যগ্রন্থ বহুল সংখ্যায় বিক্রয় হয়। এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে?

কঠোর দারিদ্র্য আপনাকে কোনোদিন দমাতে পারে নি। তবে এটা খুবই উৎকণ্ঠার বিষয় যে আপনি আজ রোগাক্রান্ত। তা সত্ত্বেও আপনার মানসিক শক্তি একটুও কমে নি। আপনার নব নব সৃষ্টি আজও অবাধ গতিতে চলেছে। আমি একান্ত মনে কামনা করছি যে আপনি নিরাময় ও দীর্ঘায়ু হোন। আপনার সৃজনীশক্তি দেশকে উদ্বুদ্ধ করুক।*

কলকাতা — আপনার

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ — মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

* বিমলচন্দ্রের পঞ্চাশতম জন্মদিবসে "ট্রেড ইউনিয়ন" সম্পাদক গোপাল ঘোষ কবির কয়েকটি বিখ্যাত বৈপ্লবিক কবিতার একখানি সংকলন প্রকাশ করেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই সংকলনের ভূমিকায় লেখেন :

"আমাদের কাব্য-জগতে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সগৌরবে অধিষ্ঠিত। তিনি অধ্যাত্মবাদের কবি নন। কেবল বিদগ্ধ সমাজের জন্যও তিনি কবিতা লেখেন না। তিনি শান্তির কবি, দেশপ্রেমের কবি, জনগণের কবি এবং তাঁর এই কবিতা পুস্তক-খানা পড়লে সকলে বুঝতে পারবেন যে তিনি সাম্যবাদেরও কবি। তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষেরা পড়েন ও বোঝেন।

"বর্তমান পুস্তকে তাঁর "ভারত", "কার্ল মার্কস", "এঙ্গেলস্", "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো শতবার্ষিকী", "মে-দিবসের গান", "২২শে এপ্রিল ১৮৭০" অর্থাৎ লেনিনের জন্মদিবস, "স্তালিন" ও "মহাচীন" প্রভৃতি ১৫টি কবিতা আছে। শিরো-নামগুলি হতেই কবিতাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

"ট্রেড ইউনিয়ন" নামক কাগজের তরফ হতে এই পুস্তকখানার প্রকাশ খুবই সমীচীন কাজ হয়েছে। সকল শ্রেণীর লোক তো এই পুস্তকখানা পড়বেনই, আমি আশা করি মজুর ও কৃষকেরাও একান্তভাবে বইখানা পড়বেন।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ — —ভূমিকা : ১২ই ডিসেম্বর

পঞ্চাশ পূর্তি ও উদাত্ত ভারত

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে যে সম্বর্ধনাজ্ঞাপনের আয়োজন করা হইয়াছে তাহার সহিত আমি নিজেকে যুক্ত করিতে পারিয়া আনন্দিত হইতেছি। তিনি নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করুন ইহাই সকলের সঙ্গে আমারও ঐকান্তিক কামনা।

আজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ নিরবচ্ছিন্ন কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন। এই ত্রিশ বৎসরের লিখিত কবিতা 'উদাত্ত-ভারত' নামক সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে কবির বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ধরণের বিষয়ের উপরে লিখিত দুই শতেরও কিছু অধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রথমেই বইখানির প্রকাশন বিষয়ে দু'একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। বাংলা কবিতা সংকলনের এমন শোভন সংস্করণ খুব বেশী নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—সব দিক হইতেই গ্রন্থখানি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় তাহা হইল এই, তাঁহার কবিতা লেখায় কোনও সচেতন প্রয়াস নাই। তাঁহার কবিতার মধ্যে যেখানে যাহা ভাল হইয়াছে, যেখানে যাহা মন্দ হইয়াছে—তাহার সমস্ত কিছু লইয়া সব কবিতার মধ্যে দিয়া একটা ক্ষত-বিক্ষত ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ স্পষ্টরূপে চিনিয়া লইবার মত পুরুষের গোটা পরিচয় ফুটিয়া ওঠে। কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এই জিনিষটিকেই আমি প্রথম মূল্য এবং বহুমূল্য দিতে চাই। প্রারম্ভেই এই কথাটা তুলিবার একটা বিশেষ কারণ আছে। কবি বিমল-চন্দ্র ঘোষ যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর (রবীন্দ্রোত্তর কথাটি এখানে আমি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ-বিরোধী এই অর্থে ব্যবহার করিতেছি) বাংলা কবিতার এই যুগটির একটা বিশেষ পরিচয় আছে। নানাবিধ কবিই এই যুগে নানা কাব্যাদর্শ এবং বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি বিশেষ গোষ্ঠী (ঠিক একমতের না হইলেও অনেক-খানি সমজাতীয়) প্রসিদ্ধি এবং প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই গোষ্ঠীর কাব্য-কৃতিতে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা এই যুগে বেশ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমরা সর্বত্র সংশয় অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার চোখে দেখি না; ইঁহাদের দানকে স্বীকার করি—শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই কবি-কৃতির মধ্যে অনুশীলিত মনের যে একটা উগ্র সচেতনতা ছিল তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না; এবং এ কথাও বার বার মনে হইয়াছে, নির্মিতির ক্ষেত্রে নির্মাতার এতখানি উগ্র সচেতনতা কবিগণের জীবনবোধ ব্যাহত করিয়াছে অথবা জীবনবোধের দৈন্য সূচিত করিয়াছে—কবিতার স্বতঃস্ফূর্তির মধ্য দিয়া কবির অন্তর্নিহিত গোটা মানুষটির সত্যকারের পরিচয় বাঞ্ছিতরূপে স্পর্শযোগ্য হইয়া উঠে নাই। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ এ ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। তাঁহার সৃষ্টি এবং তিনি যে এক তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না—কবিতার ক্ষেত্রে ইহা প্রথম লাভ—এবং পরম লাভ।

এই উগ্র সচেতনতার প্রশ্ন দেখা দেয় কবিতার প্রযুক্তি এবং তাহা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। এ কথা আমরা স্বীকার করি যে মানবচিত্তের নব নব উন্মেষের সহিত

চিত্ত-প্রকাশভঙ্গির নবত্ব অপরিহার্য এবং সাদরগ্রাহ্য; ভাষার সংকেত-শক্তিও যুগে যুগে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে রীতি-বিপর্যয় এবং শব্দ-ব্যবহার কৃচ্ছ্রতার দ্বারা অবোধ্য বাংলা না করিয়া তুলিতে পারিলে যে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসরী মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইল না এই প্রবণতাটির সাধুত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি সংশয়চিত্ত, সে সংশয় দুর্মর সংস্কার বলিয়া ধিক্‌কৃত হইলেও আমি অনুপায়। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতাগুলিতে এ জিনিসটিও লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে এগুলির ভাষা সুগঠিত—এবং স্থানে স্থানে নবগঠিত—খাঁটি বাংলা ভাষা হইয়াই আধুনিক কবিতার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও ব্যাসকুটের দ্বারা তাক লাগাইবার চেষ্টা নাই। বাংলা ভাষার বিবিধ শ্রেণীর শব্দ-শক্তির সহিত কবির সহজ পরিচয়—এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর দখল তাঁহার শক্তিমত্তার প্রতি মনকে সহজেই শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তোলে।

কিন্তু কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা যে সর্বত্রই সানন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহা নহে। তাহার বিবিধ কারণ। প্রথমতঃ মনে হইয়াছে, 'উদাত্ত ভারতের' কতকগুলি কবিতা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যেন ভাবে ও ভাষায় একটু বেশী মাত্রায় 'উদাত্ত' হইয়া উঠিয়াছে। যে সুরে প্রথম লাইনের আরম্ভ —সেই সুরে শেষ লাইনের শেষ—ইহার মধ্যে নড়-চড় যেন বড় কম। উদাত্তের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অনুদাত্ত চাই—কিছু কিছু স্বরিত-প্লুতের মিশ্রণেরও দরকার আছে—নতুবা শ্রান্তিকরতা দ্বারা আস্বাদন কিছু কিছু ব্যাহত হয়।

মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর হইয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার উগ্রতা। একটা জিনিস পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি, কবির রাজনৈতিক চেতনা শুধু তোতাবুলি নয়—এ ক্ষেত্রে তাঁহার ধ্যান-মনন 'বুলির' রূপ অতিক্রম করিয়া বিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এই বিশ্বাস তাঁহার সদাজাগ্রত জীবনবোধের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এদিক হইতে তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা কবিতার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিবার দাবী রাখে। কিন্তু স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে তাঁহার জীবনবোধের সহিত যুক্ত রাজনীতি তাঁহার অজ্ঞাতে জীবনবোধকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—তখনই তাহা কবিতার ধর্মকে খানিকটা অতিক্রম করিয়া গিয়া তর্কধর্মে—অথবা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ-আক্রমণাত্মক আবেগে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে কবিচিত্ত বৈচিত্র্যহীন 'উদাত্ত'সুরে বা রাজনৈতিক উগ্রতা দ্বারা দৃঢ়তার নামে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এমন কথা মনে করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। কবিচিত্ত থিওরিগ্রস্তও নয়—অনড়ও নয়—তাহা সদাজাগ্রত এবং সংবেদনশীল। প্রেম ও প্রকৃতি তাই সে চিত্তের স্নিগ্ধ নমনীয়তাকে স্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে।

"উদাত্তভারতের" কবিতাগুলি পড়িয়া শেষ পর্যন্ত যে কথাটা মনে অবিচলিতভাবে দেখা দেয় তাহা হইল এই—কোনও ভিড়ে হারাইয়া যাইবার কবি নন বিমলচন্দ্র ঘোষ। একটি মানুষ যাহা তাহার সবটাই তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া পাইলাম—সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আস্বাদনটির একটি নিজস্ব মূল্য ও মহিমা আছে। কবিতার ভিতর দিয়া একটি প্রাণবন্ত মানুষের মুখোমুখি আসিয়া বসিবার সুযোগ পাইলাম—এই সুযোগকে দুর্লভ বলিয়া মনে করি।

হাওড়া ব্রীজ ও বিপ্লবী কবি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

নতুন হাওড়া ব্রীজ তৈরী শেষ হয়ে এল। মানবমস্তিষ্কের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! কল্যাণময় যন্ত্র-সভ্যতার এক পরমাশ্চর্য নিদর্শন। যন্ত্রোপাসক কবি-বন্ধু বিমলচন্দ্র ঝড়ের মতো এসে হাজির : ওঠো এখনই একবার হাওড়ায় যাব। আজ হাওড়া ব্রীজের উদ্বোধন দিবস।

বললাম : সে কী! হঠাৎ হাওড়া ব্রীজ তোমাকে টানছে কেন? বললে : চাঁদ দেখেছ, ফুল দেখেছ, জন্ম-মৃত্যু দেখেছ, অনশন-নির্যাতন-হাহাকার রাত্রি-দিন দেখ্‌ছ, এবার তারই সঙ্গে সঙ্গে দেখবে চলো ইঞ্জিনীয়ার-কবি আর শ্রমিক-কবিদের সৃষ্ট মূর্তিমন্ত মহাকাব্য! হাওড়া ব্রীজ! দেখবে চলো বিজ্ঞানের মহিমা!

সুন্দর স্বপ্নভরা চোখ, মাথার বড় বড় চুলগুলি উড়ছে, যন্ত্র-পাগল কবিকে যেন আর একবার নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

এমনই কতদিন, কত খেয়ালে ঘুরেছি তার সঙ্গে, কতদিন রাত্রি গভীর হয়ে গেছে, কাব্যালোচনার আর শেষ নেই। আজ আবার নতুন খেয়াল হাওড়া ব্রীজ দেখবে।

এই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয়। সেদিন বিমলকে যেন আরো কাছে. আরো নিবিড় করে পেলাম। বিমল পরের দিনই লিখে এনে দেখালো :

"স্পর্ধিত কী বিশাল বজ্রপাণি
ইস্পাতী ছন্দের দৈববাণী
জীবন্ত সমাজের হে সন্ধানী
স্তব্ধ মুখর।
আসে ঐ দ্রুতগতি গণ-মহাকাল
স্তব্ধ তরঙ্গ হে চির উত্তাল
হাতে তব বিপ্লবী রক্তমশাল
রোমাঞ্চকর!"

[হাওড়া ব্রীজ : উদাত্ত ভারত]

গণমহাকালের অগ্রগতি কবি সেইদিনই উপলব্ধি করেছেন, আমার মনে হয় বিজ্ঞানচৈতন্যের কবির এই দিনটিই সিদ্ধিদিবস। কবিকণ্ঠের গুরুগম্ভীর ঐস্পাতিক আওয়াজ এখনো যেন গুম্‌ গুম্‌ শব্দে কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে :

"লৌহ মুকুটে কাঁপে সৌরশিখা
বিজয়টিকা!
পদতলে ভাগিরথী জলকল্লোল
পতিতোদ্ধারিণীর চিত্ত উতরোল
গুম্‌ গুম্‌ পাখোয়াজ যন্ত্রের বোল্‌
উন্নত মহিমায় গুম্‌ গুম্‌ গম্ভীর
উদ্ধত চেতনায় বিংশ শতাব্দীর
গাঙ্গেয় মৃত্তিকা লিপ্ত!
দ্রুতগামী প্রজ্ঞায় দীপ্ত!

[—হাওড়া ব্রীজ : উদাত্তভারত, পৃঃ ৬৩]

এই ধরণের ঐম্পাতিক ঝংকার বাংলাকাব্যে অভিনব। এক কথায় বিমল-চন্দ্র মানুষ ও মানুষের হাতে গড়া সৃষ্টির উদ্গাতা। মুখে বস্তুবাদী তত্ত্ব আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা অনেকেই বলেন কিন্তু সাহিত্যে তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ বড় একটা আমার চোখে পড়ে নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বিমলচন্দ্র। আজ মনে পড়ছে বিমলের লেখা ১৯৩৮ সালের একটি কবিতার কয়েকটি বিস্ময়কর পংক্তি। কবি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আজকের এই মহাজাগতিক রকেটের যুগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন :

"...বিজ্ঞানী মন, সূক্ষ্ম মনন, প্রতিভাদীপ্ত চোখে
পৃথিবীর বুকে পার্থিব সুখে অজেয় সৃষ্টিলোকে,
বুক ভরে নেয় সৌর-কাননে গ্রহপুষ্পের গন্ধ
অসীমে অসীমে ক্রমবিকশিত মুক্তপ্রাণের ছন্দ..."

[—মনন-সাগর দোলা : ১৯৩৮]

দীর্ঘদিন উভয়ে একত্রে কাটিয়েছি, পাশাপাশি অফিসে কাজ করি। কাজের ফাঁকে বিমল এসে উঁকি দেয়, মুখে তার হাসি, উদ্দাম আবেগের মূর্তিমন্ত প্রতিভূ। সংসারে মন নেই। কোনো দায়িত্বই পালন করেনি। নির্লোভ নিরাসক্ত পাগল. কবিতা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সরকারী চাকরীর নিরাপদ নিশ্চিন্ততা তার কবিচিত্তে একটি দিনের জন্যেও শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয় নি। ওর সমবয়সী সহকর্মীরা ডিপার্টমেন্ট্যাল, এস-এ-এস প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে যার কাজ গুছিয়ে নিলে। কবির ভ্রূক্ষেপ নেই, চাকরী জীবনে কোনও মোহ নেই, উচ্চাশাও নেই। বোঝাতে গেলে, বলে, চাকরী করার জন্যে জন্মাই নি!

দুপুরে কাছটিতে এসে বসে প্রতিদিনই নতুন নতুন কবিতা শোনাতো; সামান্য জলযোগ ভাগাভাগি করে খেয়ে পরমানন্দে তাই শোনা হত বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। একটি মহৎ কবির আবির্ভাব ও বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস আজ আমার চোখের ওপর চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠছে।

প্রলয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশা দিনগুলি। এলো ১৯৪৬-৪৭-এর ঝঞ্ঝামুখর দিন। কলকাতার পথে পথে মানুষের রক্তের হোলিখেলা শুরু হল। সরকারী গুলীতে কত জননী সন্তান-হারা হল, দিকে দিকে জ্বলে উঠলো বিপ্লবীর রক্তমশাল। গণমহাকালের তাণ্ডব-নৃত্য প্রত্যক্ষ করলেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তারপর আর গ্লানিকর সরকারী চাকরীশৃঙ্খল তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। একদিন তেমনি হাসিমুখে এসে বললে—আজ চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম।

সংসারের দায়িত্ব মাথার ওপর,—সাতটি নাবালক ছেলেমেয়ে, অসুস্থ স্ত্রী! বাড়ীভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা ফুটপাত দেখিয়ে দেবে! তার ওপর দেশে অন্নাভাব, বাজারে জিনিসপত্রের দাম আগুন,—আমরা তাকে বলেছিলাম মনস্থির করে থাকতে। কিন্তু বিমল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কবিতার অমর্যাদা, আত্ম-অবমাননা, উঠতে বসতে কৈফিয়ৎ দেওয়া আর নয়; আজ থেকে বারো বছর আগে সে সতের বছরের পাকা চাকরী ছেড়ে চলে এল। সর্বহারার আর্তকণ্ঠে সে তার উদাত্ত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে!

আমিও সে পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় বদলী হলাম, ঘন ঘন আর দেখা হয় না। বন্ধুত্বের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। কখনো এসপ্লানেডে, কখনো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, কখনো সাময়িক পত্রিকার অফিসে দু'জনের দেখা হয়েছে, তারপর তর্ক, কাব্যালোচনা ও সাময়িক রাজনীতির আলোচনায় সময় কেটেছে।

দেশে বামপন্থী মতবাদ ক্রমশঃ মর্যাদার আসন লাভ করছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘূর্ণাবর্ত চলেছে, আমাদের দুই বন্ধুতে নানা বিতর্ক, বিমলের সব মতের হয়ত সর্বদা সমর্থন করতে পারি নি, নিজের বক্তব্য অকপটে বলেছি, বিমল শ্রদ্ধাভরে শুনেছে। মতান্তর কোনোদিন মনান্তরে পরিণত হয়নি। আমাদের প্রীতির সম্পর্কে এতটুকু সংকীর্ণতা, নীচতা বা বিদ্বেষ ছিল না তাই বিভেদ বা বিচ্ছেদ ঘটেনি।

হয়তো ব্যথিত হয়েছি কবি বিমলচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামে এইভাবে ঝাঁপিয়ে-পড়া দেখে, কিন্তু চিরদিন তার আদর্শনিষ্ঠা, সত্যাগ্রহীর সততা, স্বেচ্ছায় ক্লেশ ও কষ্টের জীবন গ্রহণ করার দুঃসাহসকে প্রশংসা করেছি। বিমলের জীবন একাধারে প্রেম, বিপ্লব-বিশ্বাস আর বৈরাগ্যের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। বাইরের উচ্ছ্বাস আর আবেগ দেখে আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পরিমাপ করতে পারে নি ওর ভেতরকার গভীরতা। তাই সেদিন সে কষ্টের জীবনকে হাসিমুখে বরণ করতে পেরেছিল।

আজ মনে হয়, বিমল ভালোই করেছে। অর্থ তার হয়নি, অনর্থ তাকে কষ্ট দিতে পারেনি। সে শান্তিলাভ করেছে তার জ্ঞানসাধনার কঠোরতার পর সিদ্ধিলাভ করে। "জীবন্ত সমাজে"র সন্ধানী কবি তার চির উত্তাল মন নিয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে, হাতে তার বিপ্লবীর রক্তমশাল। আমার বার বার মনে পড়ে মায়কোভ্স্কীর কবিতা, মায়কোভ্স্কীর জীবন। বিমল কারো সংগে তার তুলনা পছন্দ করে না। তাই এই উল্লেখ অতি সংকোচের সংগে করছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস বিমলের কাব্য-সাধনার যেদিন প্রকৃত বিচার হবে সেদিন মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারক যে রায় দেবেন তাতে আমার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে।

জীবন ও যৌবনের কবি বিমলচন্দ্র আজ অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছেন। আজ আমাদের আয়ুসূর্য অপরাহ্নের আকাশ-রাঙানো প্রশান্তিতে ভাবগম্ভীর! কবির রচনাপ্রাচুর্য ও বলিষ্ঠতায় বিস্মিত হয়ে ভাবি, কোথায় এর উৎস? কী বিচিত্র প্রাণরসে উচ্ছল হয়ে ভোলা সন্ন্যাসীর মতো কবি তাঁর একতারা বাজিয়ে চলেছেন তা কে জানে!

কবির বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জেনে আমাদের উৎকণ্ঠার আর সীমা নেই। কবিকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর। বিমলচন্দ্রের রোমাঞ্চ-কর জীবন আগামী পঞ্চাশ শরতের সূর্যকিরণে অভিষিক্ত হোক। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, বঞ্চিত, শোষিত, অপমানিত মানবতার গান। বিপ্লবী কবির জয় হোক!

এ কালের নচিকেতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"জীবনের সূচীপত্র মন :
অসংখ্য ছাপার ভুল, অস্পষ্ট অক্ষর
দাঁড়ি নেই, মাত্রা নেই আ-কার ই-কার,
খাপছাড়া হ্রস্ব-দীর্ঘ আগত অতীত
নিতান্ত সঙ্গতিহীন
জীবন-সংবাদপত্রে আমি এক ক্রমশঃ রচনা।"

—নৈষ্কর্ম্য দর্শন, দ্বিপ্রহর

মধ্যে মধ্যে এই রকম নিরুৎসাহ নিরুদ্যম অনুভবে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; চারদিকের নির্বীর্য ভীরুতার মধ্যে, কোনোমতে বেঁচে থাকার নিদারুণ গ্লানির যন্ত্রণায় এই জীবনকে অসহ বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার আর কঙ্কাল-ছাওয়া বাংলাদেশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ থেকে আর্তনাদের মতো উদ্‌গীরিত হয়েছে :

"ডাকে দাঁড়কাক কুক্কুর কাঁদে বিকট স্বরে,
কালো বিড়ালের ছায়ায় মরণ নৃত্য করে।"

—মিশ্র রাগিনী : দক্ষিণায়ন।

কিন্তু এইখানে থেমে গেলে আজ বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্পর্কে বেশি কিছু বলবার থাকত না। দেশ, জাতি আর সভ্যতার চরম ক্রান্তিকালে কোনো মুমূর্ষুর বিদীর্ণ-বক্ষ আর্তির মতো তাঁর কবিতা মহাতামসে নিবৃত্তি লাভ করত। অথবা আর একটা দিকও ছিল। এই দুর্বহ, দুঃসহ জীবনের কাছ থেকে তিনি পলায়ন করতে পারতেন, এক কাল্পনিক অধ্যাত্ম ভারতের ভাবালুতার কুয়াশা বচনা করে ধ্যানে বসতে পারতেন। একদল ভক্ত বলত, কবি এখন তুচ্ছ মর্ত্য-জীবন ছেড়ে জ্যোতির্ময়লোকে পক্ষ-বিস্তার করেছেন, আর কবি অর্ধনিমীল-নেত্রে তাদের প্রতি বরাভয় বিস্তার করে বলতেন : 'ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।'

গত দুটি মহাযুদ্ধেই পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রব্রজ্যার উদাহরণ আমরা অনেকগুলি পেয়েছি। মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে তাঁরা অমৃতের তপে বসেছেন—ঘাতকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস করেন নি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ এই দলের নন। ধূসর শূন্যতার আতপ্ত মরুচারণাতেও তাঁর চোখের সামনে জেগেছে পুষ্পিত দিগন্ত এবং তা নিতান্তই মরীচিকার মায়া নয়। দীনতার তুচ্ছতম অস্তিত্বেও তিনি শক্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি করে-ছেন—তিনি জানেন একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গেই অগ্নি-প্রলয় সংকেতিত। তাই যদিচ :

"আমি উলুখড়,"

তবুও

"দধীচি-কঙ্কালবহ্নি বজ্রায়ুধ ঝড়।"

—উলুখড় : দ্বিপ্রহর

এই প্রত্যয়দীপ্ত আত্মচেতনা আছে বলেই বিমলচন্দ্র আজো অম্লানশক্তি—যুগপ্রাণনার সহযাত্রিক। ব্যাধিগ্রস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, মাত্র পঞ্চাশ বছরেই কবি শারীরিকভাবে অকাল জরায় আচ্ছন্ন, কিন্তু মনের দিক থেকে অপরাজিত—চির-যৌবন। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ তাঁর কবিতা থেকে আজ প্রেরণা লাভ করে।

*　　*　　*

বর্তমানের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি না থাকলেই মানুষের অতীতের দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু হয়; জীবনের রণভূমি থেকে পলাতক মন রহস্যাচ্ছন্ন বোধি-দ্রুমের ছায়ায় আশ্রয় খোঁজে—এইটিই সাধারণ নিয়ম। বিমলচন্দ্র ঘোষের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটেছে। তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বেই তিনি প্রাচীন ভারতের আত্মার সন্ধানে অগ্রসর--যে-তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াং'—তাকে আবিষ্কার করার জন্যেই তাঁর আকুলতা। কিন্তু তাঁর জাগ্রত, জিজ্ঞাসু ও বুদ্ধিদীপ্ত মন সেখানে নিজের অভীষ্টকে খুঁজে পায়নি। এ-যুগের নচিকেতা সেখান থেকে শূন্য হাতেই ফিরে এসেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জর্জরিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরে মৃত্যুমুখী মানুষের জন্য অমৃতপ্রাশনের কোনো উপকরণ সেখান থেকে আহরণ করে আনতে পারেন নি তিনি।

বরং দেখেছেন, বর্ণাশ্রমের পাপ সেখানে একটা শ্বাসরোধী পরিমণ্ডল রচনা করে রেখেছে; দেখেছেন 'ত্রি-দ্বিজ' ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের খড়্গ সেখানে শূদ্রের রক্তলেখায় রঞ্জিত। উপলব্ধি করেছেন পুরাণ-সংহিতা-তন্ত্র-মন্ত্রের নেপথ্যে ক্ষমতা-লুব্ধতা আর নিষ্ঠুরতার নগ্ন উল্লাস। প্রাচীন ভারতের এক কাল্পনিক মহিমমূর্তি রচনা করে ভাবাবেগে যারা তন্ময়—কবি দেখেছেন তাদের কল্প-বিলাসের সঙ্গে সত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন হিন্দু ভারতের শোকাবহ মৃত্যুর জন্য চিরাচরিত দীর্ঘশ্বাস তিনি ফেলেন নি—অনুভব করেছেন, এ তার প্রাপ্য ছিল, এই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নিজের কৃতির মধ্য দিয়েই আর্য ভারতবর্ষ রচনা করেছে।

বিমলচন্দ্রের এই ভারতদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'জম্বুদ্বীপ' (দ্বিপ্রহর) কবিতায়। ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ সমীক্ষায়, ধ্রুপদী ভাষায়, রূপকল্পের বিরাটত্বে এবং মৃদঙ্গ-মন্দ্রিত ভাষায় 'জম্বুদ্বীপ' বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য। এই একটিমাত্র কবিতা রচনা করেই বিমলচন্দ্র ঘোষ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারতেন।

"হে মৃত ভারতবর্ষ
যজ্ঞধূমে প্রেতবর্ণ তোমার বৈদিক মহাকাশে
বাসব বরুণ মিত্র জাতবেদাঃ বৈশ্বানর হাসে
হবিধেনু স্বর্ণলুব্ধ তৃপ্ত দেবগণ
মাটিতে কি রেখে গেছে অমেয় স্বাক্ষর
কৃষ্ণকায় অনার্যের রুধির-জর্জর?
আত্মার কৌলিন্যে আজ কী বিষণ্ণ পরিচয় তার।
পারত্রিক প্রহেলিকা লক্ষ্মীছাড়া বৈরাগ্যে উদার।"

"ধ্যানের চিতায় পুড়ে পুড়ে
তোমার সন্তানগোষ্ঠী নির্জীব খোলসে ম্রিয়মান
ছন্নছাড়া জীবনধারায়
নিরর্থক কালধ্বংসী প্রাণোপাসনায়।"

—জম্বুদ্বীপ : দ্বিপ্রহর।

এই ভাষা, এই সুর, এই নির্মোহ আত্মসমালোচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। প্রাচীন ভারতের বিচিত্রবর্ণ প্রচ্ছদচিত্রের আড়ালে যে নীরক্ত বৈরাগ্যসাধনা আর স্বার্থপরতার ভয়াল পাণ্ডুলিপি রয়েছে, কবি দুরন্ত দুঃসাহসে তার একটির পর একটি পত্রমোচন করেছেন।

"তোমার সমাধিক্ষেত্র পলাশী প্রাঙ্গণে,
যুগান্তের প্রায়শ্চিত্তে রুধির বমনে।
হাড়িকাঠ, ফাঁসিকাঠ, বেদমন্ত্র পাঠ,
ধুমাঙ্কিত তোমার ললাট
ত্যাগে বীর্যে হাহাকারে
ছন্নছাড়া নরকের দ্বারে।"

—জম্বুদ্বীপ : দ্বিপ্রহর।

অতএব অতীতের মধ্যে তাঁর কোনো আশ্রয় নেই—কোনো স্বর্ণযুগের তপোবনে, জটালম্বিত ন্যগ্রোধছায়ায় তিনি মানুষের পরমমুক্তির সন্ধান পান নি। এ যুগের নচিকেতা তাই ফিরে গেছেন শবর-ব্রাত্য-অন্ত্যজ-কিরাতদের মধ্যে—দেখেছেন তাদের 'শালপ্রাংশু মহাভুজে' ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার, জেনেছেন চির-কালের উপেক্ষিত নিগৃহীত জনসাধারণের নব উদ্বোধনের মধ্যেই ভারতের নতুন ইতিহাস ·

"বিস্মৃতির কুয়াশায়,
বলিষ্ঠ জীবন জাগে রক্তিম ঊষায়;
হে নবীন জম্বুদ্বীপ,
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
ত্রি-মুণ্ড তুষারশৃঙ্গে জ্বলে রক্তদীপ।"

—জম্বুদ্বীপ : দ্বিপ্রহর।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসেছে 'পঞ্চনিষাদ', 'ইন্দ্রপ্রস্থ' কিংবা 'তাম্রলিপ্ত'। পঞ্চপাণ্ডব যখন বারণাবতের জতুগৃহ থেকে নিশাযোগে পলায়ন করলেন, সেদিন তাঁদের মৃত্যুর সাক্ষী দেবার জন্য যে নিষাদী এবং তার পঞ্চপুত্রকে তাঁরা অগ্নিতে দগ্ধ করেছিলেন—সেই কলঙ্কিত কাহিনীর মধ্যে কবি আর্য ভারতের নিষ্ঠুর

হিংস্রতার চরমতম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। বজ্রস্বরে সেই পৌরাণিক মহাপাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন তুলেছেন কবি :

ভেসে আসে শবগন্ধ বিষাক্ত ধোঁয়ায়
ভস্মীভূত জতুগৃহ হতে।
কারা কাঁদে?

জতুগৃহে শ্বাসরুদ্ধ যুগ যুগ লাঞ্ছিত জীবন,
উপেক্ষিত শূদ্র-আত্মা ক্ষত্রিয়ের ঘৃণ্য অত্যাচারে
দুর্বিসহ ব্রাহ্মণের ঘৃণার আগুনে
কারা দেয় যুগে যুগে ষড়যন্ত্রে প্রাণ-বিসর্জন?"

—পঞ্চনিষাদ : দ্বিপ্রহর।

বিমলচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসায় প্রাচীন ভারতের—মহিমান্বিত আর্যযুগের এই-ই বাস্তব রূপ। তাই মানুষের সঞ্জীবনী মন্ত্রকে পাবার জন্য—তার যথার্থ শক্তি এবং কল্যাণের রূপকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য তিনি বর্তমানের নবজাগ্রত গণ-চেতনার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কবির এই শিল্প প্রেরণা চিরাচরিত রীতির বিপরীতমার্গী—তাঁর সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য, সবচেয়ে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

* * *

বিমলচন্দ্রের সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। দেশব্যাপী কালোবাজারী মুনাফাশিকারীর বীভৎস উল্লাসের ভেতর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতম অত্যাচারের মধ্যে। জীবনসচেতন, মানবপ্রেমিক কবি তাঁর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতাতেই নেমে এসেছেন প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনের ভেতর। সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, প্রচার করেছেন জন-সংগ্রামের বাণী —আত্মপ্রকাশ করেছেন চারণকবিরূপে।

"দীর্ঘ বিলম্বিত প্রাণযাত্রার শম্বুক গতিতে
আমার আস্থা নেই
বিশ্বাস নেই নিশ্চেষ্ট বুদ্ধিবিলাসের আশাবাদী সান্ত্বনায়।
আচম্বিত ঈশানের কালঝঞ্ঝাবেগে আমার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
সুসংগঠিত অভ্যুত্থানের অব্যর্থতায় ;
আমি বিপ্লব
আমি জয়শ্রীমণ্ডিত আগামীকালের শঙ্খনির্ঘোষ।
হে সংসার, আমাকে ভয় কোরো না,
আমি তোমার বন্ধু,
আমি তোমার অনিবার্য সংকটমোচনের বৈজয়ন্তী গান।"

—বিপ্লব : উদাত্ত ভারত।

বিমলচন্দ্র ঘোষের সাহিত্যসাধনার সাফল্যের পরিমাপ আমি করব না। এই সংকলন গ্রন্থে যোগ্যতর রসজ্ঞদের লেখনী সে-কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। পাঠক হিসেবে এ-যুগের নচিকেতার যে সত্যসন্ধান ও অমৃত-জিজ্ঞাসার অনন্য প্রয়াস আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে, সেইটিই মাত্র এখানে আমি নিবেদন করতে চাই, আর কান পেতে শুনি কবির সেই অমৃতবার্তা :

"স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয় একবিন্দু
ফুটন্ত গরম ঘামের সিন্ধু
আছড়ে পড়ছে শোষণের রুক্ষ বালুচরে
কয়েক হাজার বছরের জনারণ্য কেঁপে ওঠে বিপুল মর্মরে
শির শির করে ওঠে লক্ষ কোটি শিরদাঁড়া
কান পেতে শুনি ছন্দোবন্ধ দ্রুত পায়ের আওয়াজ :
আসে—আসে
পৃথিবীর শাশ্বত উত্তরাধিকারীরা আসে!

—উত্তরাধিকারীরা আসে : ফতোয়া।

জীবননিষ্ঠ কবি

নারায়ণ চৌধুরী

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর গুণানুরাগীরা তাঁকে সম্বর্ধিত করবার যে আয়োজন করেছেন তা'র সঙ্গে আমি আমার নাম যুক্ত করে গভীর আনন্দানুভব করছি।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ দুটি কারণে আমার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার্হ। এক, তিনি জাত-কবিদের দলের কবি এবং সেখানেও তাঁর স্থান প্রথম সারিতে; দুই, তিনি নিষ্ঠা ও চরিত্রবান সাহিত্যিক। মাত্র এই দুটি কারণই—অন্য কোন কারণ যদি তার সঙ্গে যুক্ত না-ও হয়—একজন ব্যক্তিকে অন্যদের চক্ষে প্রকৃত সম্মানার্হ করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সর্বাংশে আধুনিক কবি। মননে, মেজাজে, কাল্পনিকতায়, জীবন, জগৎ ও মানুষকে দেখবার ভঙ্গীতে একজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক; অথচ তাঁর মানস-গঠন সম্বন্ধে এইটেই লক্ষণীয় যে, তাঁর আধুনিকতা আমাদের সাহিত্যের পনেরো-আনা সাম্প্রতিক লেখকের মত নিছক আধুনিকতাতেই নিঃশেষিত নয়; তাঁর সাহিত্য-জীবনের পশ্চাতে ঐতিহ্যের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। এইটি তাঁর রচনায় বিশেষ শক্তি ও বল জুগিয়েছে। এবং এইটিই প্রধান কারণ যার জন্যে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক কোটির কবি হয়েও তথাকথিত আধুনিক কবিদের ঢংয়ে দুর্বোধ্যতাতে অস্বচ্ছ হয়ে ওঠেন নি; তাঁর কাব্য ব্যঞ্জনাগুণসমৃদ্ধ হয়েও পরিচ্ছন্ন, তাঁর ভাবের পরিমণ্ডলে প্রবেশে পদে

পদে বাধা পেতে হয় না। ঐতিহ্যের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ভাষাবৈদগ্ধ্য, ছন্দোজ্ঞান, শব্দসম্পদ, অর্থব্যক্তি—এক কথায় আঙ্গিক ও প্রকাশের নৈপুণ্য। তার সঙ্গে আধুনিক বক্তব্য যুক্ত হয়ে তাঁর রচনাকে যথার্থ আধুনিক পদবাচ্য করে তুলেছে। এখনকার মেকী-আধুনিকদের থেকে কবি বিমল ঘোষের জাত-গোত্র একেবারেই আলাদা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ চরিত্রবান লেখক এইজন্য যে, তিনি তাঁর প্রত্যয়ের জন্য মূল্য দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের আমি সমর্থন করি না, কিন্তু আমার নিকট ওই ভাবাদর্শ অগ্রাহ্য হলেও ওই বিশ্বাসের জন্য তাঁর ত্যাগস্বীকারকে আমি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই। তিনি যা বিশ্বাস করেন তার জন্য ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারে তিনি পশ্চাৎপদ নন, বস্তুত এই বাবদে জীবনে তাঁকে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতেও হয়েছে—এই আদর্শনিষ্ঠা ক্ষুদ্র এই লেখকের মনোহরণ করে নিয়েছে এবং তাঁকে আত্মিক দিক দিয়ে বিমলচন্দ্রের অতি কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে।

আমরা মুখে অনেক গালভরা কথা বলি বটে, আমাদের কাজে তার প্রমাণ নেই। অন্তর-লালিত প্রত্যয় যে বর্গের বা যে মতাদর্শেরই অনুবর্তী হোক না কেন, তার জন্য ত্যাগ ও মূল্য স্বীকারের রেওয়াজ একপ্রকার উঠেই গেছে সাম্প্রতিককালীন লেখকদের মধ্যে। সবাই আমরা কেজো ও প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ, ত্যাগব্রতীকে বাস্তববুদ্ধিশূন্য ও অসারস্বপ্নচারী আখ্যা দিয়ে নিজেদের সেয়ানা বুদ্ধির অভিমানে নিজেরা ডগমগ হয়ে উঠতে পারলে আর কিছু চাই না। কিন্তু জীবনে প্রকৃত মূল্য যদি কোন বস্তুর থেকে থাকে তবে তা স্বপ্নেরই আছে, আদর্শেরই আছে—কেজো বুদ্ধিকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনও মূল্য দেন না।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে বিমলচন্দ্র ঘোষের ব্যক্তিত্বকে প্রচলিত গতানু-গতিক মূল্যমানের এক প্রবল ব্যতিক্রম বলা যায়। ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ও এমনতর একটি ব্যতিক্রম ছিলেন। বিমলচন্দ্র ওই একই ধারার সাধক। তাঁর ন্যায় একান্তভাবে সাহিত্যগতপ্রাণ লেখক একালে সত্যিই বিরল। জীবনা-চরণকে তিনি সাহিত্যসাধনার সঙ্গে একাঙ্গী করে নিতে পেরেছেন, আর তাইতেই তাঁর শক্তির অপ্রতিরোধ্যতা।

বিমলচন্দ্র রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে এই মতাবলম্বী কি ওই মতাবলম্বী সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল তিনি মানবদরদী। নির্যাতিত, শোষিত শ্রেণীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় সহানুভূতি, আর অন্যায়ের প্রতি তাঁর অনুরূপ পরিমাণে রোষ ও ক্ষোভ। তাঁর ক্ষোভের তিক্ততাকে এক এক সময় আমার আত্যন্তিক ও তার প্রকাশকে অতিরিক্ত উগ্র বলে মনে হয়েছে, তা বলে অন্যায় ও অবিচারের প্রতি তাঁর মজ্জাগত অসহিষ্ণুতাকে আমি অন্যায় মনে করতে পারি নি। সামাজিক অবিচার ও কুবিচারের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা জাত-লিখিয়ের একটি প্রধান লক্ষণ। তিনি সর্বদাই পীড়িত শ্রেণীর বন্ধু। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সহজাত মানবতা তাঁকে অমিতশক্তি লেখনীর অধিকারী করে তুলেছে। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

মানুষের কবি

কৃষ্ণ ধর

॥ ১ ॥

কবিতার জন্য আমরা আকুল হয়ে থাকি। এক গভীর তৃপ্তি নিয়ে কবিতা পড়ি, কখনও বা লিখি। কবির জন্মদিনকে নিজের জন্মদিন বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলেই গৌরব। কবিতার চেহারা প্রত্যেক দশকে বদলে যাচ্ছে। কারণ, এক-একটা দশকের আলোড়নে আমাদের অস্তিত্ব বিক্ষুব্ধ, বিচলিত। যিনি ত্রিশ বছর ধরে অবিরাম কবিতা লিখছেন তাঁর পক্ষেও স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেক সৎ কবির অস্তিত্বকেই বাইরের জগৎ ভীষণভাবে আলোড়িত করে, প্রভাবিত করে। এই আলোড়িত চেতনাকেই কবিতা নতুন রূপ দেয়, ভাষা দেয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের এক প্রশস্ত চেতনায় জন্মেছি। তিনিই আমাদের চেতনাকে শাণিত করেছেন, কথা বলিয়েছেন। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চেয়েছি। কোনো ব্যক্তিগত স্পর্ধা নিয়ে নয়, সময়ের বিড়ম্বনায়। আমরা যে সময়ে জন্মেছি, সেই যুগে অনেক কিছু বিশ্বাস ভাঙছে, অনেক নতুনতর বিশ্বাস আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে। এই ভাঙা-বিশ্বাসের যুগে আমরা বিমলচন্দ্রের কবিতা পাঠ করেছি এক বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে। আমাদের চিন্তা, আমাদের অনুভূতি ইতিপূর্বেই বিপন্ন ছিল। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতায় নতুন চেতনার সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। কারণ, বিমলচন্দ্র ঘোষ এক স্বতন্ত্র সংস্কার নিয়ে, বিমুগ্ধ আবেগ ও সুতীব্র মননকে সঙ্গী করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছিলেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পড়ে বুঝতে শিখলাম, তখন তাঁর পাশাপাশি আরও অনেক স্বতন্ত্র কবির কাব্য-পরীক্ষার ধারা প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করবার জন্য সেই প্রাণবন্ত প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানিয়ে বাংলা কাব্যের নতুনতর মুক্তির সন্ধান করছিলাম।

বিমলচন্দ্র ঘোষ সেই পরীক্ষার যুগে এক স্বতন্ত্র ভঙ্গি নিয়ে এলেন।। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, বিমলচন্দ্রের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিল ক্ষীণ। এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো কোনো রোমান্টিক সংশয় নিয়ে কবিতার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন নি। একটা নিজস্ব বিশ্বাস ও বলদৃপ্ত আশাবাদ এবং সুগভীর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি কবিতার জগতে দেখা দিয়েছিলেন। সংশয়ের কুয়াশায় তাঁর চেতনা কোনোদিনই বিপন্ন হয় নি। কারণ জীবন সম্পর্কে আদর্শগত আশাবাদে গোড়া থেকেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এখানেই অন্যান্য আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁর বিপুল ব্যবধান। তাঁর কবিতার মধ্যেই কবির ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। যা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছাড়া আর কারো কবিতায় খুব বেশি স্পষ্ট করে লক্ষ্য করি নি। আমরা, অন্যান্য আধুনিকরা, একটা যুগের সমবেতভাবে প্রতিনিধিত্ব করছি। বিমলচন্দ্র তাঁর কাব্যে একটি আদর্শের মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরে সগর্বে, কখনও বা যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলেছেন : 'আমাকে দেখো, আমার রক্তাক্ত হৃদয়কে প্রত্যক্ষ করো।' এমন প্রত্যয়ী স্বরে এ-যুগের আর ক'জন কবিই বা কথা বলতে পেরেছেন। বিমলচন্দ্রের কবিতার যাঁরা অনুরাগী ন'ন, তাঁরাও এই বলবান কবির কবিতাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ, এক উজ্জ্বল আলোকের

মতো তাঁর কবিতা অমল সত্তায়, অমিতাভ প্রেমের অনুরাগে আপন বৈশিষ্ট্যে সমসাময়িক মনকে আকৃষ্ট করেছে। দীর্ঘদিন তাঁর কবিতা সযত্নে পাঠ করে আমার কেবলই মনে হয়েছে বিমলচন্দ্রের কবিসত্তা বন্দী প্রমিথিয়ুসের মতো। বন্ধনের যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ মানবকল্যাণী প্রমিথিয়ুস একদিন দেবতার রোষবহ্নির বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

'Yet he never can doom me to death, I shall live evermore.'
—*Aeschylus*: *Prometheus Bound*.

বিমলচন্দ্রও তেমনি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বন্দী প্রমিথিয়ুসের মতোই পর্বতশীর্ষ থেকে বলছেন :

O Earth, thou beholdest my wrong.

॥ ২ ॥

বিমলচন্দ্রের কবিসত্তা আমাদের ঐতিহ্যের চেতনায় পরিশীলিত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোনো আধুনিক কবির কাব্যচেতনায় এমন অবিরলভাবে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক-ঐতিহ্য ও সময় চেতনা উপস্থিত নয়। ভারতবর্ষের মহাকাব্য, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্যাদি কবির বিশেষভাবে অধিগত। এই কারণে বিমলচন্দ্রের কবিতার দেশজ স্বাদ অন্য সকলের চাইতে বেশি। কিন্তু ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা কবিকে পশ্চাদগামী করে নি। ঐতিহ্যকে তিনি সমসাময়িক চেতনার আলোকে পুনর্বিচার করে তাকে নতুন যুগের জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। ঐতিহ্যের সম্প্রসারণই আধুনিক অগ্রগামী কবির মুখ্য দায়িত্ব। ভারতীয় ঐতিহ্য ও মানবিক ঐতিহ্য মার্ক্সবাদে স্থিত-প্রত্যয় বিমলচন্দ্রের কবিতায় পরমাশ্চর্য সমন্বয়ে এক নতুন কাব্যসত্যের জন্ম দিয়েছে। বিমলচন্দ্র আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও আপন কালের সত্য ও তার স্বতঃবিরোধ সম্পর্কে অনবহিত ন'ন। কারণ আপন কালের অন্তর্নিহিত সত্য, সমাজবাস্তবতা ও কবিসত্তায় তার প্রভাব থেকেই আধুনিক কবিতার জন্ম। বিমলচন্দ্র এই সমসাময়িকতাকে অস্বীকার করেন নি। বরং এ-কথা বলা চলে যে সমসাময়িক কালের চেতনা, ঐতিহ্যের ঐতিহাসিকতার মতোই তাঁর কাব্যে খুব স্পষ্টভাবে উপস্থিত। এই স্পষ্টতা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন। আবেগে আর্ত হয়ে তিনি যদি ভেরীবাদকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন তাহলেও কাব্যবিচারে তাঁর কবিতা বাতিল হয়ে যায় না। সমসাময়িক কালের যন্ত্রণায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠলে কবিকে কখনও কখনও ঘোষকের ভূমিকা নিতে হয়, কথাসাহিত্যিককেও। প্রত্যেক সৎ এবং আন্তরিক কবিই একথা স্বীকার করবেন যে বিশেষ সময়ের ঘটনায় আলোড়িত হয়ে সচেতন কবিকে অনেক মৌন চিন্তকে রূপ দিতে হয় অগ্নিগর্ভ ভাষায়। একমাত্র অপ্রত্যক্ষ চিত্রকল্পই সূক্ষ্মতার সৌন্দর্যালোকে কবিতাকে হাত ধরে পৌঁছে দেয় একথা আমি স্বীকার করি না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা (আফ্রিকা, প্রশ্ন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিব, শিবাজী, উৎসব) বিশেষ কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিকে স্মরণ করে লেখা। আবেগের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনেও এই কবিতাগুলো আমাদের রসলোকের সন্ধান দিয়েছে। কবির ব্যক্তিগত বক্তব্যও এতে প্রত্যক্ষ ভাষণের আকারে বারংবার আমাদের সুপ্ত চেতনাকে দোলা দিয়ে সামগ্রিক চেতনার সমুদ্রে পৌঁছে দিয়েছে। কবিতা বিচারে আবেগকেই মুখ্যস্থান দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই।

আবেগের মুক্তিই তার সৌন্দর্য বিচারের মানদণ্ড। এবং এই মুক্তি একমাত্র সচেতন কবির পক্ষেই সম্ভব। কবিতা অবশ্যই 'conscious and deliberate' হবে। এলিয়টের কথাগুলো এক্ষেত্রে আমার সঠিক মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন :

Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to escape from these things.

একমাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচেতন কবির পক্ষেই আবেগের স্রোত থেকে মুক্ত হয়ে কাব্যস্রোতে তাকে প্রবাহিত করা সম্ভব। বিমলচন্দ্রের কবিসত্তায় ব্যক্তিত্ব ও সচেতনতা এই দুটি আকাঙ্ক্ষিত গুণেই সানন্দে লক্ষ্য করেছি। তাঁর কাব্য-সাধনায় ব্যক্তিমানসের যন্ত্রণা ও আবেগ বৃহত্তর মানবাত্মার যন্ত্রণা ও আবেগে রূপায়িত। আমরা যে যুগে বাস করছি, বিমলচন্দ্র সেই যুগের অনুচ্চারিত, উচ্চারিত ও স্তব্ধ বিস্ময়কে আহত অভিমানের রূপকল্পে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। যুগলক্ষণাক্রান্ত বিমলচন্দ্রের কবিতার চেহারা তাই সহজে আমাদের মন স্পর্শ করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি যুগকে অতিক্রম করেছেন, নিজেকেও। কোনো সৎ কবিই যুগকে অস্বীকার করতে পারেন না, নিজেকেও না। আধুনিক কালের আলোড়িত সময়তরঙ্গ, বিক্ষুব্ধ চেতনা এবং বিচলিত সমাজ-চৈতন্যই কবিকে কাব্যরচনায় অভিলাষী করে তোলে। বিমলচন্দ্র যে সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন, সে যুগটা রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ছিল অস্থির। সেই অস্থিরতা থেকে কবিমানসে যে সংক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, কবিসত্তার আবেগের মুখে সেই অস্থিরতাই এক বৃহৎ সামাজিক জবানীতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অথচ বিমলচন্দ্রের সমকালীন অন্যান্য কোনো কোনো কবিদের সুর অনেকাংশে আত্মলীন, অপ্রত্যক্ষ এবং ভঙ্গিসর্বস্বতায় সমাজ-সত্যের বিরোধী। বিমলচন্দ্র সেই কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে যদি নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য আধুনিকতাবিরোধী বলা ঐতিহাসিক সত্যকেই অস্বীকার করা। আশাহত সমাজজীবনে, ঐতিহ্যের বিনষ্টির যুগে এই কবি-কণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রজ্ঞাকেই আবেগে উৎসারিত করেছিল। তিনি সেজন্যেই নির্দ্বিধ কণ্ঠে বলতে পেরেছেন :

শিল্পী আমি স্রষ্টা আমি বস্তুবাদী কবি
বহুর একক প্রতিচ্ছবি
সংহত উদার আমি সৃষ্টির পরম অহংকার
আমি গান বিশ্বচেতনার।

কবি যে এখানে বিশ্বচেতনার গান গেয়েছেন বলে আত্মসচেতন সেজন্য তাঁর কবিত্বের ব্যত্যয় ঘটবে কেন? রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুবার নিজেকে 'পৃথিবীর কবি'রূপে আখ্যাত করেছেন। এই আত্মসচেতনতার জন্য কবিসত্তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় অনুভূতি সহৃদয় হৃদয়ে প্রবেশের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। বস্তুত আধুনিক কবিতা আত্মসচেতন হতে বাধ্য। এলিয়টের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে, আধুনিক কবিতা অবশ্যই 'সচেতন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত' হবে।

কারণ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় অতিবাস্তব প্রতিকূল সামাজিকতার আঘাতে অস্তিত্বের সংকট প্রত্যেক সং ও মানবতাবাদী কবি শিল্পীকে যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ করে তোলে। 'এই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে কবিকণ্ঠে শাশ্বতকালের সত্য উৎসারিত হয়। আমি বিমলচন্দ্রকে সেই নিরবধি কালের কবি বলে মনে করি।

॥ ৩ ॥

নিরবধিকালের জন্য কবিতার উদাত্ত অর্ঘ্য নিবেদন করেও বিমলচন্দ্র আপন কালেরই কবি। মানবসমাজের মুক্তির জন্য বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদে অবিচল প্রত্যয়ী বলেই তিনি দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে এক উদার মানবিক আদর্শে নিজের কাব্যা-দর্শকে সংযুক্ত করেছেন। কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশকে যদি আমরা সূক্ষ্মতার সম্মান দিই, ব্যক্তিগত বোধ থেকে উৎসারিত মহৎ মানবিক অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করা কাব্য-বিচারের ভ্রান্তিই প্রতিপন্ন করে। কবি বিমলচন্দ্র মানুষের কবি এবং নিজের হৃদয়েরও কবি। এই দুই সত্যেও কোনো বিরোধ নেই। থাকতেও পারে না। সামাজিক হৃদয়ের যে আনন্দ ও বেদনা, প্রেম ও প্রত্যয় কবির হৃদয়কে তরঙ্গিত করেছে, এই বলিষ্ঠ কবির অনুভূতিতে তারই প্রকৃত প্রতিফলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যেহেতু তিনি সময়ের বলয়িত মুহূর্তে বন্দী অথচ অনাদি কালের আকাঙ্ক্ষায় অনিরুদ্ধপ্রাণ, সেই হেতুই তার প্রকাশ এত প্রদীপ্ত প্রাণাবেগে থরো থরো। অবশ্যই তিনি সামাজিক অভিজ্ঞতায় নিজের অনুভূতিকে শাণিত করেছেন। সংগ্রামের জন্য নিজের সত্তাকে করেছেন প্রস্তুত। এই নিরন্তর আত্মিক সংগ্রাম থেকেই এক একটি সত্যানুভূতি কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের স্রোতে একে আমি আত্মসমর্পণ বলবো না। এ তো সময়ের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আগামী দিনের উত্তরাধিকারীর স্বপ্নের বীজ বোনা। শেলীর মতো তিনিও এখানে 'participates in the eternal, the infinite and the one.' অনাদিকালের অংশভাগী হবার জন্য, পরম একের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য তাঁর আকুলতা অপারিসীম। কবির এই এক-নিষ্ঠতাকে অনেকে কবিত্বের আত্মাভিমান বলে ভুল করেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজ-বাদে যাঁর বিশ্বাস অবিচলিত তাঁর সম্বন্ধে আত্মাভিমানের অপবাদ শত্রুপক্ষের অপপ্রচার। তিনি ঘোষকও ন'ন, প্রবক্তাও ন'ন। তিনি কবি এটাই তাঁর সব-চেয়ে গৌরবের বিশেষণ।

কবির মুখ থেকেই তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা শুনে তৃপ্ত হয়েছি :

> কবিতা বিপ্লবী-মনোবাসনার অগ্রগামী সুর
> অব্যাহত আবেগের আশ্চর্য বাঙ্ময় শালীনতা;
> আকাশ-কাঁপানো স্বচ্ছ-চেতনার মূর্ত প্রতিধ্বনি
> খণ্ডকালে বন্দী এক অখণ্ডকালের অধীরতা।

—কাব্যদর্শন : উদাত্ত ভারত।

'অখণ্ডকালের অধীরতায়' তিনি 'আচম্বিতে নিশিডাক শোনা'র মতো খণ্ডকালের প্রতিভাত সত্যে কবিতাকে বন্দী করতে চেয়েছেন। কোনো ঘোষণা দিয়ে নয়, বিদ্রোহ দিয়ে নয়, মনের অব্যাহত আবেগকে বাঙ্ময়তায় স্মরণীয় করতে চেয়েছেন তিনি।

এই ভীরু স্বার্থান্ধ ব্যক্তিসর্বস্বতার কোলাহলে অনেকের কাছে বিমলচন্দ্রের আন্তরিক কাব্যকর্ম 'আত্মিক সংকটের স্পর্শহীন', 'গভীর বেদনাবোধরহিত', 'কৃত্রিম ও তাৎপর্যহীন' মনে হয়েছে বলে শোনা গেছে। এর কারণ, ব্যক্তিসত্তার জিজ্ঞাসার নামে ইদানীন্তন বাংলা কাব্যে একশ্রেণীর নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমান, হতাশা ও যন্ত্রণার কথা শুনতে পাই যার সঙ্গে কাব্যসত্যের কোনো অন্তর-সম্পর্ক নেই। সমাজসত্যকে অস্বীকার করে নিতান্ত ব্যক্তিগত, সত্য ও অর্ধ-সত্যকে কবিতায় রূপ দেবার এই চেষ্টাকে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান সংকট বলে আমি মনে করি। বিমলচন্দ্রের কবিমন এই অসুখে কখনও আক্রান্ত হয় নি। তাই তিনি সত্যের ছলনায় বিভ্রান্ত হন নি, সত্যকেই সাধ্যরূপে লাভ করেছেন। ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধ বা হতাশা থেকে কবির কাব্যের অমিততেজ নিসৃত নয়, তার ক্ষোভ সে কারণেও নয়। বৃহৎ মানবিক অনুভূতি, সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কে স্বচ্ছদৃষ্টিই তাঁর কবিতাকে অনন্য সার্থকতায় আলোকিত করেছে।

বিমলচন্দ্রের কবিতাকে তাই আমার ভাস্কর্যশিল্পের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময়, চিত্রধর্মী। বিমলচন্দ্র কাব্যের ভাস্কর। তাঁর কবিতা তাই স্পর্শগ্রাহ্য। একে ছোঁয়া যায়। প্রতিটি শব্দের ভাঁজে ভাঁজে কী এক দুঃসহ বেদনা, অপরিসীম অভিলাষ আর অনন্ত প্রেম বলয়িত হয়ে সমগ্র কবিতাকে এপস্টাইনের ভাস্কর্যের মতো মহিমান্বিত করে তুলেছে :

প্রেত নয় : শুধু ইউরোপ থেকে কবর-ফাটানো
আঁকা-বাঁকা রাঙা শতবর্ষের
প্রচণ্ডতম রক্তের ধূম
ঘনীভূত মেঘ ক্ষুব্ধ নিঝুম
বাজে-ঠাসা কালো নিঃশ্বাসে জাগা
প্রেত নয়; নরগোষ্ঠির শালপ্রাংশু কাঁধের
বিদ্রোহী কালবৈশাখে দোলা-লাগা...

—শতবার্ষিকী ১৮৪৮-১৯৪৮ : ফতোয়া।

এই কবিতাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়. ভাস্কর্যের বিস্মিত সৌন্দর্য নিয়ে বিমলচন্দ্রের এমন অনেক কবিতা এখনও আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। একথা অবশ্য ঠিক তিনি অতিমাত্রায় শব্দপ্রিয়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পরি-চয়ের জন্যেই সম্ভবত তিনি শব্দ দিয়ে ধ্বনির জাদু তৈরী করতে চেয়েছেন। এই শব্দসংগ্রহে তিনি ইদানীন্তনকালে প্রায় একক বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক নতুন শব্দ আহরণ করে কবিতাকে সুশ্রী করেছেন, বিমলচন্দ্রের শব্দপ্রীতি তাঁর কাব্যের পৌরুষের সহজাত অঙ্গকান্তি। ভাস্করের ন্যায় শব্দ কুঁদে তিনি এক একটি কবিতার রূপকর্ম তৈরী করেছেন। স্বভাবতই এই কারণে তাঁর কবিতায় লোকপ্রচলিত বাকরীতির ব্যবহার কম. কিন্তু এই রীতি পরিহার লোকজীবনের অস্বিষ্টের প্রতি কোনো বীতরাগের জন্য নয়, তাঁর সৎ কবি স্বভাবের অভিব্যক্তির তাগিদেই। সহজিয়া দেহতত্ত্বের চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ করে তিনি আধুনিক চিত্তসংকটের সন্ধান খোঁজেন নি। এটা লৌকিক জীবন-রীতিবিরুদ্ধ, অবিশ্বাসী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর নিজের তৈরী 'মিথ্'। তিনি সুন্দর জীবনকে চেয়েছেন। তার সাধনাতেই তিনি আর্তকণ্ঠ। কিন্তু এই

আর্তি ও বেদনা কোনো রহস্যাবৃত মায়ালোকের উপাদান নয়। ফরাসি কবি বোদলেয়রের (অনেক আধুনিক যাঁর ব্যর্থ অনুকারী) মতো তিনি 'ঈশ্বর' ও 'শয়তানে'র মধ্যে দোল খেয়ে সৌন্দর্যের নবমূল্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি। তিনি সোজাসুজিই শয়তানকে শরাঘাতে বিদ্ধ করেছেন। প্রখর সমাজচেতনাই যদি কবিকে এই শরসন্ধানে দক্ষতা এনে দিয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে অস্বীকার করবো না। তিনি মানুষের হয়ে আপনকালের ও নিরবধিকালের শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং এই দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি কবিতার প্রতি আন্তরিক হয়েই, সমাজ-বিপ্লবীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে নয়।

॥ ৪ ॥

অথচ আমি বিমলচন্দ্রকে অমিতাভ প্রেমের কবিরূপেও স্বীকার করি। এই প্রেম জীবনের প্রতি এক সুগভীর মমতায় আত্মস্থ। অনিকেত হৃদয়-অন্বেষায় কোনো ভীরু বাসনার অঞ্জলি ভরে তোলেন নি তিনি। প্রণয়-পিপাসায় এই বলবান কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে প্রেমের অমৃত সুর। জীবন, জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে তিনি শুধু বিদ্রোহের প্রেরণাই পান নি, পেয়েছেন প্রেমের আলোকিত যাদু।

আধুনিক মানুষের বিচলিত আবেগানুভূতি (shifting sensibility) এই কবির ইদানীং কালের কবিতায় বিস্মিত তীব্রতা নিয়ে বারবার ধরা দিয়েছে। আমি বিমলচন্দ্রের এই পরিণতিতে আনন্দিত। কারণ, আমার বিশ্বাস, কবি-মাত্রেই প্রেমিক। বিশ্বাসের জন্য, জগতের জন্য, মানুষের জন্য তাঁর অনুরাগই কবিতার মৌল প্রেরণা। শেষের দিকের কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষ বক্তব্যের প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই মুক্তি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, পরীক্ষার মধ্য দিয়েই হয়েছে। আঙ্গিকের দিকেও তিনি সহজ, মরমী ও লাবণ্যময় হয়েছেন। বিমল-চন্দ্রের এই রূপান্তর কোনো স্বতঃবিরোধ থেকে হয় নি। জনজীবনের অনুভূতির সঙ্গে তাঁর গভীরতম পরিচয় ও সাযুজ্যবোধ থেকেই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। বাইরের কোনো তাগিদে নয়। অবশ্য তিনি ইতিপূর্বেও লিরিকের সুরে কথা বলেছেন। গীতিময়তাকে আবেগের আগুনে প্রজ্বলিত করে তুলে-ছেন। বিমলচন্দ্রের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'রক্তগোলাপ' তাঁর পরিণত মনের স্নিগ্ধ চিত্র। এই স্নিগ্ধতা বিপ্লবী মনের স্থিত প্রত্যয়, অবিচলিত নিষ্ঠায় লাবণ্য-মণ্ডিত। শব্দের ভার এখানে অশ্রুবিগলিত তন্ময়তায় হৃদয়-অন্বেষী। 'যা হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, সেই অসম্ভবকে সারাজীবন ভাবি!' [অসম্ভবা : রক্তগোলাপ] এ সুর অন্যতর ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। যৌবনের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে যে অসম্ভবের জন্য হাত বাড়াই, ক্লান্ত অপরাহ্নে মনে হয় সব বুঝি ফুরিয়ে গেল :

> অনেক আশাবাদী প্রেম
> অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন
> অনেক ভাবের আবেগ
> কলম দিয়ে বেরুতে চায়
> বেরোয় না।

—রক্তগোলাপ

মনে হয় বিষণ্ণতার সুর লেগেছে কবির মনে। এ বিষণ্ণতা ব্যক্তিগত হতাশার প্রতিফলন নয়। উজ্জ্বলতর মানবজীবনের যে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা সকলে কণ্ঠ মিলিয়েছি তার সম্ভাবনা বিলম্বিত বলেই কি কবির কণ্ঠে ক্লান্তির ছোঁয়া? বিমলচন্দ্র হয়তো কোনোদিনই ক্লান্ত হবেন না। তিনি বিদ্রোহের ঔদ্ধত্য নিয়ে এসেছেন, বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থাকে। ১৯৪৮-৫০ সালে তিনি ব্যঙ্গের আগুনে বিদ্রূপের তরবারিতে শক্তিমানের অন্যায়কে যেভাবে জর্জরিত করেছিলেন তাতো আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই উচ্চ কণ্ঠের যুগে একমাত্র বিমলচন্দ্রই সার্থক কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। এবং সেই ক্ষোভ-মদির যুগ অতিক্রমণের পরও তার ধ্বনি কানে বাজছে, অবিরল জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জনের মতো: 'ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনী করেছো, ক্ষুধিতকে আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক।'

আমি বিমলচন্দ্রের এই দুই রূপেরই অনুরাগী। উভয় চেতনাতেই তিনি সৎ এই কথা মনে রেখে এবং সব কথা শেষ হয়ে গেলে, উদ্বেল জীবনসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে একথাই বারবার মনে হয়, কবি বলছেন:

তুমি আর আমি
অনন্তকাল পরস্পরের মধ্যে মিশে আছি
তুমি আর আমি
অনন্তকাল পরস্পরের জন্যে কেঁদেছি
তুমি আর আমি
কেউ কাউকে কখনো চাই নি।

—তুমি কোথায়: রক্তগোলাপ।

স্নেহদ্বীপের দ্বৈপায়ন

গোলাম কুদ্দুস

বিমলদা'র কাব্য সম্পর্কে নিরাসক্তচিত্তে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ যে-পরিবেশে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় সে পরিবেশে হৃদয়ের উত্তাপ এত বেশী ছিল যে আজো সে-কথা ভাবলে নির্বিকার বিচারের প্রয়োজন তুচ্ছ মনে হয়।

তখন ১৯৪৯ সালে এক ধরণের বিপ্লবী উন্মাদনা প্রাণের বিনিময়ে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেককেই পেয়ে বসেছিল। সেই সময় আমাদের কারো কারো কাছে বিমলদা'র বাসা ছিল অনেকটা উদ্বেলিত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে স্নেহ ও হৃদ্যতাপূর্ণ দ্বীপের মত।

অথচ দ্বীপবাসীর বিচ্ছিন্নতা সেখানে ছিল না। আজো নেই। এদেশের সকল আলোড়ন, সকল বেদনা এবং সকল স্বপ্ন সারা দেশের মত সেখানেও একই রকম ভীড় করে আছে। ফলে সেখানে হৃদয়ের জ্বালা কোনোদিন জুড়ালো না, মানুষের শত্রুদের সঙ্গে কোনোদিন সেখানে প্রকাশ্যে বা গোপনে সন্ধিপত্রে কোনো স্বাক্ষর পড়ল না,. বরং সেখানে দেশের আপামর জনসাধারণের মতই বাঁচার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হ'ল প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে।

বেশ মনে আছে একদিন বিমলদার বাড়ীর গলির মুখে একটি ভিখারীর সম্মুখীন হয়েছিলাম। ভিখারীটি হয়ত কিছু পাবে না জেনেও নিতান্ত অভ্যাস-বশেই ভিক্ষাপাত্রটি এগিয়ে দিয়েছিল এবং আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দু'আনা পয়সা পড়ল তার এনামেলের বাটিতে। চকিতে চোখ তুলে তাকিয়েছিল ভিখারী এবং বোধ করি হঠাৎ প্রাপ্তি-যোগেই তার মুখে ফুটে উঠেছিল ঠিক বিদ্যুতের মত আনন্দের রেখা। এত ক্ষণিকের সৌন্দর্য খুব কমই চোখে পড়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দুশ্চিন্তার মেঘ এসে তার সারা মুখের হঠাৎ খুশীর বিদ্যুতকে ঢেকে দিয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখলাম আর বিমলদার বাড়ীতে ঢুকলাম। মনে মনে ভাবলাম দেশের নানা জনের মনে ও মুখে নানা ধরণের দুশ্চিন্তা এমন ঘন কালো মেঘের মত ছেয়ে আছে যে সাধ্য কি আমরা তাদের মুখে অনেকক্ষণের জন্য হাসি ফুটিয়ে রাখি। একটু হাসির রোদ লাগলেও পরক্ষণেই ঘনিয়ে আছে কিসের গাঢ় ছায়া। তাকে সরাতে হলে প্রয়োজন বহুজনের বহুদিনের আয়াস। তাই তো আমাদের সংঘ-বদ্ধ প্রয়াস। বিমলদা তা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝেন। মনে আছে সেদিন বিমলদা'কে এ সব কিছুই না বলে অনুরোধ করেছিলাম নিজের মুখে আবৃত্তি করতে তাঁর বিখ্যাত কবিতা—"ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ!"

ক্ষুধা হচ্ছে সেই মেঘ যা ঘন দুশ্চিন্তার অন্ধকারসৃষ্ট মনের আকাশে টেনে দেয় যেন একটা কালো যবনিকা। আর সেই যবনিকার আড়ালে ঢাকা পড়তে শুরু করে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য, সকল ফুল, সকল পাখী, সকল ঋতু, সকল চন্দ্র সূর্য-তারা এবং সকল মানবিক সম্পর্কের মধুরতা। আমরা চোখ থাকতেও দেখতে পাই না কখন দ্বারপথে বসন্তের অতিথি এসে ফিরে গেল। কচি শ্যামল দুর্বাদল হযত পা দিয়ে মাড়িয়ে যাই, চোখ দিয়ে আদর করার মত মন এবং মেজাজ কোথায়? আমার মনে হয় সৌন্দর্য এবং ক্ষুধার এই অহি-নকুল সম্পর্ক বিমলদা'কে প্রায় পাগল ক'রে তোলে। এ তাঁর সারা কাব্যে তাঁকে অস্থির করে, কিছুতেই থামতে দেয় না। সারা দেশে যেমন এই অপরূপ যন্ত্রণার শান্ত সমাধান নেই, যেমন তা মানুষকে নামিয়ে এনেছে পথের ধূলায় সভা-শোভাযাত্রায়, তেমনি বেদনার এই ভিসুবিয়াস বিমলদার কবিতায় মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত।

ক্ষুধা সারা দেশে এবং বিমলদা'র ঘরে বছরের পর বছর হানা দিচ্ছে। অনেক মন্বন্তর পার হয়ে এসে অনেক সময় ভয়ে বিস্ময়ে ভেবেছি এতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে উপার্জনহীন সংসারে চলে কি ক'রে। সে দুরন্ত ইতিহাসের সবটা বাইরের লোক কোনোদিনই জানতে পারবে না। তবু তার মধ্যেও অফুরন্ত প্রাণ এবং প্রেম বন্ধুবান্ধবদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করেছে। আর এমন দিন গেছে যখন পুলিশের কৃপায় অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে হয়ত কোনো রাত্রে বিমলদা'র ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেপিলের সঙ্গে মলিন শয্যায় রাত কাটিয়েছি ছেঁড়া লেপ গায়ে দিয়ে। এর পর বিমলদা'র কবিতাকে তুলাদণ্ডে যে ওজন করে করুক, আমি পারব না।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বিমলদা'র কবিতার আমি কোনো সমালোচনা করলে তিনি কখনো রাগ করেন না, এ আমি বারবার লক্ষ্য করেছি। অথচ একই প্রকারের সমালোচনা কারো কারো কাছ থেকে তিনি আদৌ সহ্য করতে পারেন না। কারণ হয়ত এই সেখানে আন্তরিকতার বদলে অসূয়া থাকে, কঠিন জীবনসংগ্রামের প্রতি মমতার বদলে উন্নাসিক সৌন্দর্যপিপাসার অহেতুক

দম্ভ থাকে, কিম্বা থাকে নির্বিকল্প অনাত্মীয় উদাসীন সাহিত্য-বিচার। কেউ কেউ বলতে পারেন, ভালবাসা তোমাকে অন্ধ করেছে। বলা বাহুল্য, এরূপ অন্ধত্বের থিয়োরী আমি মানি না এবং ভুল বলে মনে করি। বরং আমার ধারণা ভালবাসলে দাবি হ্রাস পাওয়ার বদলে আরো বৃদ্ধি পায়। সেই দাবিতেই আমি বলত চাই, যদিও তাঁর অনেক সার্থক ও মহৎ কবিতা আছে তবু—বিমলদা'র কাছ থেকে আমরা আরো মহৎ এবং আরো সুন্দর কবিতা চাই! আর সেইজন্যই চাই তিনি শতায়ু হোন!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ভেরা নভিকভা

["বেঙগলস্কাইয়া পোয়েজিয়া" নামে ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাঙালী কবিদের (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর) একখানি বাংলা কাব্য-সংকলন রুশ ভাষায় শ্রীমতী ভেরা নভিকভার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় ও লেখক-পরিচিতির মধ্যে শ্রীমতী নভিকভা কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এখানে মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়া হ'ল।]

বিমলচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৯১০ খৃষ্টাব্দ) বাংলাদেশের একজন সৌন্দর্যস্রষ্টা প্রগতিশীল কবি। দৈনিক 'স্বাধীনতা' ও 'পরিচয়' পত্রিকার নিয়মিত লেখক বিমলচন্দ্র বাংলা কাব্যের মানবতা ও বাস্তবতার মহত্তম ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সচেতন সৃজনশীলতায়। ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "জীবন ও রাত্রি" প্রকাশিত হয়। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে "দক্ষিণায়ন" (১৯৪১), "উলুখড়" (১৯৪৩), "দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা" (১৯৪৫), "ফতোয়া", "সাবিত্রী" (১৯৫১)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সংকলন "উদাত্ত ভারত" প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতাবলী সমসাময়িক বাস্তব জীবনের সঙ্গে এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য এশিয়ার জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাব্যের বহুমুখী বৈচিত্র্য প্রতিফলিত; এর মধ্যে রয়েছে ব্যালাডধর্মী ও প্রেমের কবিতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক গীতি-কবিতা এবং বহু বিচিত্র কবিতা। এই বৈচিত্র্যময় সামগ্রিকতার মধ্যে ঘটেছে বিমলচন্দ্র ঘোষের মৌলিক বাস্তবতাবোধ এবং শক্তিশালী বৈপ্লবিক রোমান্টিসিজমের সংমিশ্রণ।

*   *   *

শান্তি-কপোতের বর্ণনার মধ্যে (বিশ্বশান্তি) বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যের চিত্রময়তা অভিব্যাপ্ত হয়েছে। যে শান্তি-কপোত ভল্গার বুক থেকে শান্তি-বারি বহন ক'রে নিয়ে চলেছে দেশ-দেশান্তরে—তাইবারে, রাইনে, গঙ্গায়, ইয়াংসি-কিয়াঙে। সৌন্দর্যের এই প্রতীক বাস্তবিকপক্ষে সমাজতন্ত্রের দেশগুলিরই জীবন্ত ভাবধারার স্বাক্ষর। এই বাঙালী কবি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় এবং সম্ভ্রম-পূর্ণ বাণীবিন্যাসে সোভিয়েত ভূমিকে অভিনন্দিত করেন। তাঁর এই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কারণ, এই মহান দেশ এশিয়ার জনগণকে তাদের যুগ-যুগান্তরের দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে সহায়তা করেছে। তাঁর "আজ এক আশ্চর্য

মানুষের জন্মদিন" (লেনিন) কবিতাটি তিনি উৎসর্গ করেছেন রুশ-বিপ্লবের মহানায়ক এবং এশিয়ার নির্যাতীত জনগণের পরম বন্ধু লেনিনের উদ্দেশে। তিনি বলেছেন :

"আজ এক পরমাশ্চর্য মানুষের জন্মদিন।
এই দিনটি প্রতি বৎসর জগতকে এগিয়ে দেয় :
সফলতার দিকে
শান্তির দিকে
সম্প্রীতির দিকে।
এই দিনটি মানুষকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখায় :
নতুন ক'রে পথ চলার নতুন ছন্দে
নতুন জীবন-বিশ্বাসের নতুন গানে
নতুন পৃথিবী গঠনের দিকে।" *

—অনুবাদক : প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

* বাংলা কবিতার রুশ অনুবাদ-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পর বিমলচন্দ্রের সর্বাধিক সংখ্যক কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির বাংলা নাম : (১) রবীন্দ্রনাথের তাজমহল। (২) কোকিল। (৩) অপরূপ রাত্রি। (৪) প্রশ্ন। (৫) মৃত্যুঞ্জয় পাখী। (৬) রাত্রিশেষ। (৭) শেষ-উইল। (৮) হাওড়ার ব্রীজ। (৯) প্রেম ও সমাজ। (১০) বৈশাখ : ঋতুরঙ্গ। (১১) মে-দিনের গান। (১২) বিশ্বশান্তি। (১৩) আজ এক পরমাশ্চর্য মানুষের জন্মদিন। —অনুবাদক

অগ্নিহোত্রী

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ পঞ্চাশোর্ধ হয়েছেন। তবে আশার কথা তাঁর দেহ ব্লাডপ্রেসার স্ট্রোকের ফলে যতই দুর্বল হোক, তাঁর জীবনদৃষ্টিতে কি কাব্য-প্রকাশে কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির স্থিতধী নিয়ে তিনি জীবনকেই ক্রমশ বলিষ্ঠতর দৃষ্টিতে দেখছেন এবং বেশী ক'রে ভালোবাসছেন। জীবনের ও সমাজের যা কিছু ক্লেদ, যা কিছু অসঙ্গতি, তা'র বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও আপসহীন সংগ্রাম তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কবিতাবলী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ক্রমশই নবনবোন্মেষিত হচ্ছে। এইখানেই কবির অপরাজেয় প্রাণশক্তির পরিচয় পাচ্ছি।

যে বয়সে সীমাহীন আকাশ কবির মনে ভীতির সৃষ্টি করে, তারাদের উজ্জ্বল জিজ্ঞাসার আধিক্যে আত্মকেন্দ্রিক কবির মনে সব স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায়, —সে বয়সে বস্তুবাদী কবি বিমলচন্দ্র জীবনের ও সমাজের প্রতিটি অন্যায়কে অমিতশক্তিতে জেরা করার জেদ সমানে রক্ষা ক'রে চলেছেন।

এই মানসিক শক্তির মূল কোথায়, ভাবতে চেষ্টা করেছি বিস্ময়ের সঙ্গে কিন্তু কোনো সমাধানে পৌঁছতে পেরেছি এ কথা বলি না। তবু মনে হয় একদা গুরুগৃহে বেদান্ত-অধ্যয়ন এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা যে কবিকে

কৈশোর ও প্রথম যৌবনে নির্বিকল্প বৈরাগ্যসাধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল, তারই ফলে সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাঁর এই সচেতন দায়িত্ববোধ জন্মেছে।

"উদ্বোধনে'র মতো গুরুগম্ভীর দার্শনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে-তরুণের একাধিক কবিতা প্রকাশিত হ'ত, সেই আত্মমুক্তিকামী ঈশ্বরবাদী কবিই পরবর্তী কালে সমাজজীবনের সকল কাঁটা অগ্রাহ্য ক'রে ক্ষত-বিক্ষত দেহে জীবনের "রক্তগোলাপ" চয়ন করেছেন। জীবন ও কাব্য-প্রচেষ্টায় সামঞ্জস্য ঘটাতে গিয়ে বহুবিড়ম্বিত হয়েও সবুজপ্রাণের মন্ত্র আজও নতুন ক'রে শিখবার আগ্রহ তাঁর অপরিসীম। বেদান্ত থেকে বস্তুবাদী চেতনায় উত্তরণ যে এই ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবির পক্ষে কোন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নয়, তা স্পষ্ট বোঝা যায় বর্তমানে তাঁর কাব্য-সাধনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মননের সঙ্গে বৈদান্তিক ভারতীয় ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য প্রচেষ্টায়।

মনে পড়ে, ১৯৩৩ সালে "দেশ" পত্রিকার দপ্তরে (১, বর্মণ স্ট্রীট) এক শ্মশ্রুগুম্ফধারী তেজস্বী তরুণ সাধু—বিভাগীয় সম্পাদক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বচসা শুরু করেছিল তার প্রকাশিত কবিতার একটি 'লাইনে'র কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে ব'লে। সেই তরুণ সাধু প্রবল যুক্তিতে প্রমাণ করেছিল যে তার রচিত পংক্তিটি নির্ভুল ছিল। সেদিন তার মধ্যে যে তেজ, আত্মবিশ্বাস এবং আপসহীন মনোভাব লক্ষ্য করেছিলাম, সেই বীজেরই বনস্পতিরূপ আজকের বিপ্লবী ও প্রেমিক কবি বিমলচন্দ্র। সেদিন থেকে সে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

কয়েক বছরের মধ্যেই তার চুল-দাড়ির বিলোপ ঘটেছিল. সাধু বলে ভ্রম হবার বহিরাবরণ আর চোখে পড়ে নি কিছু. কিন্তু অন্তরে খাঁটি কবিমনের পাশাপাশি যে একটা রুক্ষ নির্মম সাধু-মন সব রকম অসাধুতাকে ধিক্কৃত করেছে, সেই সহজাত সাধুতাই আজ স্বকীয়তা দান করেছে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে।

জীবনের সর্পিল পথে মাথা উঁচু করে সোজা চলবার জেদ রাখতে গিয়ে বিমলচন্দ্র হয়তো ভগ্নপ্রায় হয়েছেন বহুবার. কিন্তু নমনীয়তা দেখিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস পান নি কি কাব্যে, কি জীবনে। তাই বিমলকে যতখানি স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে অনেক বেশী।

বিমলচন্দ্রের দারিদ্র্যযন্ত্রণাক্লিষ্ট সংসারের কথা যখন ভাবি তখন দুর্ভাবনায় স্থির থাকতে পারি না। কিন্তু বিমল "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"। ব্যাধিজনিত অকালজরাতেও সে যেন প্রাণোজ্জ্বল যৌবনের বসন্তদূত। কাব্য আর সংসার যেন তার সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিমলচন্দ্রের বিপ্লবচেতনা ও মানবতাবোধ কল্পনাবিলাসীর উচ্ছ্বাস নয়। কবি স্বয়ং যেন মূর্তিমন্ত মানবতা। এর প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে কবির "রক্তগোলাপ"-এর একটি কবিতার অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"হঠাৎ কানে এল সদ্যজাত শিশুর গোঙানি!
আমরা থমকে দাঁড়ালুম
বুকে উৎকণ্ঠা
চোখ আর কান সজাগ!
গোঙানিটা আসছে
কয়েক হাজার বছরের বুক চিরে।

তুমি ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেলে
বাঁ দিকের ফুটপাত ঘেঁষে।
কী অসহ্য অন্ধকার!
পাশের একটা দৈত্যপুরী থেকে
রাক্ষুসে নাক-ডাকার শব্দ আসছে।
আকাশে অতিকায় ভ্রমর গুঞ্জন
মিত্রপক্ষের একটা প্লেন উড়ে গেল।

তুমি ফিরে এলে
বুকে রক্তমাখা ন্যাকড়া জড়ানো
একটা সজীব মানবশিশু।
ভারীগলায় বললে. "এর জন্যে দায়ী কে?"

বললুম. "এই আদিম অন্ধকার।"
উত্তর দিলে, "এই বর্বরতাকে জয় করতে হবে,
এগিয়ে চলো!"

[—জন্মাষ্টমী : রক্তগোলাপ : পৃঃ ৯৩]

কাহিনী নয়! এগিয়ে-চলার কবি বিমলচন্দ্রের জীবনেরই একটি অধ্যায়। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী! মানবতা আর দুঃসাহসিকতার এমন বিচিত্র সমন্বয় আর কোথাও দেখি নি। কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরম স্নেহের এই "এক-জোড়া পাগলের" মতো লক্ষজোড়া পাগল যদি আজ এদেশে থাকতো!!

---

* কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিমলচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, পুরো চিঠিখানি "বারোমাস", হৈমন্তী সংখ্যা, ১৩৬১ সালে প্রকাশিত। যতীন্দ্রনাথ লিখছেন : .. "তুমি যে সব পাগলামী পূর্বে করেছ—তার তুলনায় এবারের পাগলামী বিশেষ কিছু নয় বুঝছি। মহৎ কাজ বাহাদুরী দেখাবার জন্য না কোরে প্রকৃতিগত 'দুর্বলতাবশে' যারা করে তাদের ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়েই যায়। কিন্তু শুভার্থী হিসাবে দুশ্চিন্তারও যথেষ্ট অবসর থেকে যায়। আশা করি তোমরা দুজনে তেমাদের নূতন দায়িত্ব সহজেই বহন করতে পারবে। আমার পরিচিতের মধ্যে তোমাদের মত 'একজোড়া পাগল' নেই। সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা মহত্বকে খাটো করাও বটে; আর বৃথাও বটে!"—২৮।৪।১৯৪৫

সম্পাদকীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও পাঠকদের সঙ্গে আমিও তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলা সাহিত্যের দিগ্বিজয় যাত্রায় কবি বিমলচন্দ্র তাঁর পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং সেই পতাকা কেবল তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষরই বহন করিতেছে না, বাংলাদেশের একটি যুগ-মানসকেও প্রতিফলিত করিতেছে।

কবি বিমলচন্দ্র এই যুগ-মানসের সার্থক প্রতিনিধি এবং যে যুগের বক্তা-রূপে তিনি তাঁর কাব্য-সাহিত্যে পৌরুষের সঙ্গে দণ্ডায়মান, সেই যুগ জনগণের নূতন জীবনমূল্যকে স্বীকার করিতেছে। তাঁর কবিতা অলস কল্পনা নয়, কেবল সোনালি স্বপন নয়, কঠোর বাস্তবতা ও জীবন-সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ সঙ্গীত।

গত ১৯৫৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরে 'যুগান্তর'-এর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কবি বিমলচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভা লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই সময় প্রকাশিত তাঁর 'উদাত্ত ভারত' নামে বৃহৎ কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেই আমি তাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। এখানে পুনরায় আমি সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাঁর পঞ্চাশ-তম জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের একটি কাব্য-সংকলন সম্প্রতি "উদাত্ত ভারত" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গত ত্রিশ বছর ধরিয়া—১৯২৬ সাল হইতে বর্তমান ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সবগুলি কবিতাই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য "উদাত্ত ভারত" গত ত্রিশ বছরের লেখা কবিতাবলীর সংকলন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা কেবল মূল্যবান সংকলন নহে, ইহা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের নূতন সম্পদ। আধুনিক যুগ রাজনৈতিক দলবদ্ধতার যুগ, গোষ্ঠীগত প্রচারের যুগ। এই প্রচারের যাঁরা সুযোগ লইতে না পারেন, সাধারণতঃ তাঁরা উপেক্ষিত হন। যদিও বিমলচন্দ্র ঘোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তথাপি তাঁর কাব্যপ্রতিভা আজও সাধারণের মধ্যে—সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে, প্রচারযন্ত্রের অন্যান্য মাধ্যমে সেই পরিচিতি ও স্বীকৃতি পায় নাই, যেটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তির জন্য তাঁর পক্ষে সহজলভ্য হওয়া উচিত ছিল।

কোন কোন মানুষ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় চিরদিন দুঃখ পাইয়া থাকে এবং সেই দুঃখের অন্যতম বড় কারণ দারিদ্র্য। অবশ্য ভাগ্য সেই সামাজিক বৈষম্যেরই অন্যতম নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং কবি বিমলচন্দ্র ভাগ্যের সেই ক্রূর পরিহাসের দ্বারা লাঞ্ছিত। তিনি নিজেই "চাকুরি করো" নামে ছোট্ট একটি কবিতায় এই অবস্থাটা অপরিসীম বিদ্রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আশ্চর্য, তথাপি তিনি নিরন্ন দরিদ্র সংসারে কবিতা লিখিয়া যাইতেছেন। পাগল, প্রেমিক ও প্রতিভাকে মহাকবি সেক্সপীয়র একই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বাংলার কবি বিমল-চন্দ্র ইংলণ্ডের মহাকবির এই উক্তির একজন জীবন্ত বাহন।

কিন্তু অদ্ভুত কবিতা লিখিয়াছেন বিমলচন্দ্র এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ঐশ্বর্যের মধ্যেও এই কবি বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্যসাধারণ। বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথ হইতে দাঁড়কাক কিম্বা মার্ক্সীয় চিন্তা-বিপ্লবের শতবার্ষিকী হইতে, ডার্বির টিকেট কেনা পর্যন্ত হেন বিষয় ও বস্তু নাই, যার উপর বিমলচন্দ্র তাঁর শক্তিশালী লেখনী চালনা করেন নাই। এই সংকলনগ্রন্থের কেবলমাত্র সূচীপত্রের উপর চোখ বুলাইলেই বুঝা যাইবে কত অসংখ্য বিষয় ও প্রশ্ন কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে এবং আরও বিস্ময়ের কথা অসাধারণ ছন্দবৈচিত্র্যে কবিতাগুলি বিচিত্র এবং এই দিক দিয়াও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের প্রথম শ্রেণীর কবিদের সারিতে (এবং সেই সারিতেও বেশী লোক নাই) আমরা অনায়াসেই বিমলচন্দ্রকে স্থান দিতে পারি।

"উদাত্ত ভারত"—এই গ্রন্থের নামকরণ সার্থক। "এই বিশাল ভারতভূমির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি তাঁর নিজস্ব বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে" যাহা কিছু ভাবিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই কাব্যগ্রন্থে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। আর সেই কণ্ঠের ভাষা ও ভঙ্গি কী নিদারুণ! সুস্থ, বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলি যেন জীবন্ত অগ্নিপিন্ড—যে অগ্নি রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার এবং অবিচার ও শোষণকে দহন করিবে, যে অগ্নি তীক্ষ্ন বিদ্রূপবাণের মত পাথরের বুকও বিদ্ধ করিবে। অথচ অন্যদিকে এই অগ্নি ভারতবর্ষের মহিমময় আত্মার দ্যুতি বিকিরণ করিতেছে, মানবতার পরিশুদ্ধ রূপকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের জয়যাত্রা নিশ্চয়ই নূতন নহে—বন্দী ভারতের এবং অপমানিত মানুষের মুক্তির গান বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রাণসম্পদ। এই হিসাবে একমাত্র বিমলচন্দ্র নিশ্চয়ই মৌলিক নহেন। এমনকি তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তও নহেন। এ যুগের কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই সেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সমাজ-বিপ্লবের যে চিত্র ও চিন্তা রক্ষণশীল শাসক ও বিত্তবান পালকদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, গণদেবতার সেই নিষ্ঠুর ঐতিহাসিক অভিযানকে খুব কম কবিই ইহার আগে এমন বিরাট পটভূমিকায় এতটা সাফল্যের ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে ধ্বনিত করিতে পারিয়াছেন।

এজন্য বর্তমান মুহূর্তে তিনি স্বতন্ত্র ও অনন্যসাধারণ। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই সরকারী পুরস্কার বিতরণসভায় তিনি স্বীকৃতি পান নাই। যখন যুদ্ধক্ষত ও জীবনাহত ইউরোপীয় কেতাবীবিদ্যা হইতে ধার-করা এক শ্রেণীর ইন্টেলেক্‌চুয়াল্ ন্যাকামি এবং গদ্যও নয়, পদ্যও নয়, এক প্রকারের হিজড়ে জাতীয় অপভাষা অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্যমনীষা বলিয়া বন্দিত হইতেছে, তখন সেই দুর্বোধ্য দুর্বলতার প্রোপাগান্ডার দিনে বিপ্লবের কণ্ঠস্বরকে ভয় করাই স্বাভাবিক। আর এই ভীতির জন্যই বিপ্লবপন্থী লেখকদিগকে অস্বীকার করিবার একটা চাপা চেষ্টা চলিতেছে চারিদিকে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাংলাদেশে রসিক আছেন, বোদ্ধা আছেন, আর আছেন বিপ্লবী চিন্তাকে গ্রহণের জন্য এক শ্রেণীর উন্মুখ পাঠক। ইঁহাদের জন্যই "বিপজ্জনক লেখকেরা" আজও বাঁচিয়া আছেন এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবেন। এমনকি বড়লোকের পৃষ্ঠ-পোষিত অনুগ্রহদৃষ্টি না মিলিলেও রসগ্রাহী উদার মনের অকুণ্ঠিত বন্দনা বর্ষিত হইবে "উদাত্ত ভারত"-এর উপর।

আমাদের চারিদিকে পৃথিবীর আশ্চর্য ইতিহাস রচিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যে সেই পৃথিবীর বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। নূতন চিন্তা, নূতন দৃষ্টি এবং নূতন মন বাংলা সাহিত্যের গবাক্ষ দিয়া এই নিখিল মানব-সমাজকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে এবং মনুষ্যজাতির কল্যাণের পক্ষে যে সংগীত সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত, কোন কোন শক্তিশালী লেখক ও কবি সেই মন্ত্র দুঃসাহসের সংগে উচ্চারণ করিতেছে। আগামী যুগের ভারত মুক্ত মানবতার সেই উদার মন্ত্রে উদ্বোধিত হইতে চলিয়াছে, আধুনিক কবিতার উদাত্ত কণ্ঠে সেই বাণী ঘোষিত। সেই বাণী বাংলার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া ইতিপূর্বে বৃহৎ আন্তর্জাতিকতার নিখিল মানবতাকে গ্রহণ করিয়াছে। আজ অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে—সম্মুখে বা পিছনে কোন্ দিকে সে মোড় ফিরিবে, সেই দুশ্চিন্তা তার ললাটে। কিন্তু একদিন কবি বর্ণিত "বুড়ো ভগবান গোলমেলে এই দুনিয়াব সম্পত্তি" 'শেষ-উইল' মারফৎ তাদের নামেই লিখিয়া দিয়া যাইবেন, যারা আজ "বস্তির ধুলাকাদামাখা ন্যাংটা হতভাগা ছেলে"! এবং সংগে সংগে রূপান্তরিত সমাজের চরিত্র ও চেহারাও সেই মহৎ দানের কীর্তিকে গ্রহণ করিবার জন্য নূতনতর সংস্কৃতির ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের বলিষ্ঠ লেখনী ভারতবর্ষের সেই পুণ্যময় মহৎ সম্ভাবনাকে দুর্জয় বিশ্বাসের দ্বারা সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। ছন্দে, ভাবে, ব্যঞ্জনায় ও রসে কবিতাগুলি অপরূপ। আমরাও তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানাই অন্তরের প্রীতির দ্বারা। পূর্বাচার্যগণের আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হউক।

রক্তগোলাপ

সরোজকুমার দত্ত

"রক্তগোলাপে" সংকলিত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৫০ সাল থেকে ১৩৬৪ সাল। অর্থাৎ বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যবিকাশের এই সর্বাধুনিক পর্যায়ের সূচনাকাল পঞ্চাশের মন্বন্তর। যে কোন হৃদয়বান ও অনুভূতিপ্রবণ মানুষেব পক্ষেই এই সময়টি প্রচন্ড মানস আলোড়নের সময়। অতএব, বিমলচন্দ্র ঘোষের মত কবির পক্ষে এই সময়টিকে কাব্যে বিধৃত করে রাখার প্রয়াস মোটেই বিস্ময়কর নয়। বিস্ময়কর হচ্ছে এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি। পুরাতন ও প্রচলিত আধারে যখন আধেয়কে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন সচেতন অবলীলায় নূতন আধারকে গ্রহণের দক্ষতা বিমলচন্দ্র ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর "রক্তগোলাপ" কাব্যগ্রন্থ এই দক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও প্রদর্শনী বলেই আমার মনে হয়েছে।

বিমলচন্দ্র গণ-আন্দোলন, গণ-জাগরণ ও গণ-মানসের কবি বলেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু আবেগ তার মূল অবলম্বন হলেও যে একমাত্র অবলম্বন নয় এবং আধুনিক গভীর অর্থে সর্বজনবোধ্য ও সর্বমর্মস্পর্শী হতে পারে তার প্রমাণ এই যে, বিমলচন্দ্রের নির্দিষ্ট ও ঘোষিত মতাদর্শের প্রতি যাঁরা কঠোর বিরূপতা পোষণ করেন তাঁরাও বিমলচন্দ্রের কাব্যের অনুরাগী। কিন্তু "রক্তগোলাপ" কাব্যগ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আবেগের উদ্বেলতা ও

প্রত্যক্ষতাকে তিনি কঠোর আত্মসংযমে এমন একটি অনুদ্বেল গভীরতা ও অপ্রত্যক্ষ তীব্রতায় পরিণত করতে পেরেছেন যার সঙ্গে মননশীলতা ও সূক্ষ্মতার সংযোগে এক নূতন ধরনের কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট গদ্য-কাব্য এর রূপমূর্তির আদর্শ, কিন্তু ভাববস্তুর অধিকতর আধুনিকতার কঠোর তাগিদে এই আদর্শের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ-উত্তরণের প্রয়াসও সুস্পষ্ট। "রক্তগোলাপ" কাব্যগ্রন্থের প্রথম স্তবকের কবিতাগুলি মূলত প্রেম-ধর্মী। কিন্তু প্রত্যয় ও আদর্শের বৈজ্ঞানিক আধুনিকতায় বিশিষ্ট।

"জীবন্ত কামনার বুকে মুখ
লুকিয়ে যখন বললে,
"আমরা শেষ হয়ে গেছি!"
আমার পূর্ণতার অন্ধকার তখন
বুকের মধ্যে শিউরে উঠলো।।

দপ্ করে জ্বলেই নিবে গেল
আমার সুদীর্ঘ প্রত্যাশার স্বপ্নশিখা!
দ্যুতি হারালো যৌবরক্তের রত্নাবলী
সেই অসংযত আত্মবিলুপ্তির
বাসর ঘরে।

আকস্মিক বিস্ফোরণে বিদীর্ণ
আমার সেই আগ্নেয় সত্তার মধ্যে,
চূর্ণ হলো তোমার শিলামূর্তি
আমার পরিপূর্ণতার ভীষণতায়।"

—আত্মবিলুপ্তি : রক্তগোলাপ, ২৬ পৃষ্ঠা

"রক্তগোলাপে"র দ্বিতীয় স্তবক মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক, যদিও বলা বাহুল্য, দুই স্তবকই একই সুরের সূত্রে গ্রথিত। প্রথম স্তবক থেকে দ্বিতীয় স্তবকেই বিমলচন্দ্র বেশী স্বপ্রকাশ। শ্রেণী-তিক্ততার যন্ত্রণা ও শ্লেষ এই স্তবকের প্রতিটি কবিতার চারিপাশে একটি আক্রোশের অগ্নিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই কবিতাগুলির মাঝে মাঝে যখন আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ নির্মম বিদ্রূপ বিদ্যুৎ বিকাশের মত ঝলসে ওঠে তখন বিমলচন্দ্রের পূর্বসূরী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু মিলের মত তাঁর সঙ্গে বিমলচন্দ্রের পার্থক্যও এখানে সুস্পষ্ট!

বিমলচন্দ্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাই তিক্ততাতেই তাঁর পরিসমাপ্তি হয় নি।

"জীবনকে ভাল বাসতে বাসতে যারা শেষ হয়ে গেল,
তাদের কণ্ঠস্বর ডালিমগাছের হাওয়ায় কাঁপে,
রূপনারায়ণের সোনালী বালুচরে
স্তরে স্তরে নিস্তব্ধ ঢেউ তোলে!
আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে
এই সব একরোখা প্রেমিকেরা
শাশ্বত!

এদের প্রত্যেকের রক্তচন্দনমাখা আত্মা
মৃগনাভির সুরভিমদির মন
বুকভরা সংকল্পের
কিংশুকবর্ণ ছায়াশরীর
আমাদের আগামী কালের মহাপরিধির মধ্যে
থম থম করে।"

—আমরা ভুলি নি : রক্তগোলাপ-৬৪ পৃঃ

"ভারতমাতা" সুদীর্ঘ কবিতা। খোলাখুলিই রাজনৈতিক ও প্রচারমূলক কবিতা। বিষয়বস্তু, স্বাধীন ভারতের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। এই কবিতাটিতে এমন কতকগুলি চিত্র ও চিত্রকল্প উপস্থিত করা হয়েছে, যার দৈনন্দিনতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, অথচ পরিবেশনার মুন্সিয়ানার ফলে যা পড়তে গেলেই ঘৃণায় ও ভয়ে চমকে উঠতে হয়। "শিকড়" পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের জীবন নিয়ে রূপক কবিতা। "ঝড়ের চিঠি", "ফাঁসি", "টেবিল" সবই এই সুরের ছোট-বড় বিস্ময়কর কবিতা। এই কবিতাগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া স্থানাভাবে সম্ভব হল না। অনুমানে মনে হয় "ফাঁসি" কবিতাটি কেনিয়ার কোনো দেশভক্তের ফাঁসি নিয়ে লেখা। কবিতাটি উপলক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ লক্ষ্যে উত্তরণের একটি আশ্চর্য নিদর্শন।

"ঠাণ্ডা অসাড় নীলকণ্ঠ সূর্যের দেহটা
উঠছে
ক্রমাগত উঠছে
মাটি ছেড়ে শূন্য ভেদ করে উঠছে!

ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের আলো
নির্বাপিত শরীরের প্রলয়ঙ্কর উত্তাপে।
হঠাৎ অসহ্য ঝলকায় ঝলসে গেল
অন্ধকার—

ফাঁসীকাঠটা জ্বালানী কাঠের মত
দাউ দাউ করে জ্বলে গেল।

—ফাঁসী : রক্তগোলাপ-৮৪ পৃঃ

"রক্তগোলাপ" রক্ত ও কাঁটার কাব্য। এ কাব্যের রস তিক্ত ও তীব্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজজীবনের নিমরস যাঁরা পান করতে চান বা ভালবাসেন "রক্তগোলাপ" তাঁদের নিত্যসহচর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—রবিবারের 'স্বাধীনতা' : ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৯

রক্তগোলাপ

মণীন্দ্র রায়

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে]

সব স্মৃতি গান নয়
সব কথা মন্ত্রের আগুন
জ্বালে না হৃদয়ে প্রতিদিন।
পৃথিবীর শস্য, সাধ, রৌদ্র, ভালবাসা
সবাই দু'হাতে টানি, বল তো ক'জন
মিটাই সে ঋণ?

তবু কেউ কেউ আসে
শীতরিক্ত ব্যর্থতার নিষ্প্রাণ শিরায়
আনে তা'রা প্রাণের উত্তাপ।
হাজার পাতার ভিড়ে
উষার শিশিরে ধোওয়া সতেজ, সুন্দর
তেমনি উঠেছে ফুটে আমাদের এ রক্তগোলাপ॥

নিখিল মনের কবি

অমলেন্দু দত্ত

[বিমলচন্দ্রের ৫০ বৎসর বয়ঃপূর্তিতে]

সূর্যের সারথি হয়ে চেতনার বিমর্ষ আকাশে
ছড়ালেও লক্ষ কোটি দ্যুতিময় প্রাণের কণিকা
আকাশ-দুহিতা তবু পৃথিবীর প্রণয়ে বাঁধা সে,
মরীচিকা-লুব্ধ নয়—স্থিতপ্রজ্ঞ রুদ্রললাটিকা!
সাম্যবাদী সত্যকাম জীবনের জীবন্ত শরিক
—লোকে তাকে কবি বলে নিজেকে সে বলে দার্শনিক।

মায়া নয়, মমত্ববোধের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে সে গুণী।
ঘরের দেয়াল ঘিরে কবিগুরু, বিবেক, লেনিন,
খৃষ্ট, গোর্কি—বহমান প্রবুদ্ধ চিন্তার সুরধুনী
তৃপ্ত অবগাহনের রোমাঞ্চ জাগায় রাত্রিদিন।
অমিত বাঙময় রূপ প্রাগ্রসর সুতীক্ষ্ণ মেধায়
আগ্নেয় স্বপ্নের দূত নিদ্রাহীন রাতে ডেকে যায়।

আশ্চর্য, সে-ডাকে তার ধ্যানস্তব্ধ মনে ওঠে ঝড়
বৈশাখের; যদি ফের ফাল্গুনের ফেরারি কোকিল
ডেকে ওঠে—কেঁদে ওঠে জীবনের বোবা দ্বিপ্রহর
কোনো এক অতীতের বিস্মৃত ব্যথায় খুঁজে মিল
তবে সে-ও সাড়া দেয়, সে-ব্যথায় তারও কাঁদে প্রাণ;
ঝড়ের সে লেখে স্বরলিপি, হৃদয়ের সুরে বাঁধে গান।

উৎস ধারা

[বিমলচন্দ্রের পঞ্চাশৎ জন্মতিথি স্মরণে]

অমিয় ভট্টাচার্য

যখন প্রাণের উৎসে জীবনের আরক্ত প্রণয়
শিখা হ'য়ে দুলে ওঠে, অন্ধকারে দুরন্ত পাবক
সংশয়ের চিতা জ্বালে চোখে জাগে কঠিন প্রত্যয়,
তখন তোমার বাণী যেন তারই সুতীব্র স্মারক।
যখন এ ছিন্নভিন্ন জীবনের ক্লান্ত কলরব
একে একে থেমে আসে জন্ম নেয় হৃদয়ের গান,
যে নির্জনে ফুল ফোটে রাত্রি হয় স্বপ্নের সৌরভ
তুমি সেই মনোলোকে আছো প্রেম-ক্ষমায় অম্লান।

কারণ আমি যে জানি বেদনার অশান্ত তুফান
তুমিও সয়েছ ঢের: ভস্মসাৎ অনেক আশার
নির্ধূম সমাধিস্তূপে ব'সে তবু চাও নি নির্বাণ!
নও তুমি নীলকণ্ঠ অলৌকিক সত্তার আধার।
তুমি শুধু কবি তাই জীবনের অন্য মূল্যমান
সেখানে নিতান্ত তুচ্ছ, ফিরে যায় রাজকীয় দান।

শব্দের প্রচণ্ড ক্ষুধা

[বারোমাসের কবি-সম্পাদককে]

সিদ্ধেশ্বর সেন

শব্দের প্রচণ্ড ক্ষুধা, সে চেয়েছে মুদ্রিত অক্ষর
ভেঙেচুরে ব্যক্ত হয়, শূন্যনীল ডানাঝাড়া পাখী
ঘুরে ঘুরে ঊর্ধ্বে ওড়ে, নিচে ক্লান্তি, হিম, পাতা, খড়,
একেক অতীত থেকে জীবন সম্মুখবর্তী না কী?
কে চায় দুরন্ত রৌদ্র দিক তাকে দহনের জ্বালা,
নীল নবঘন মেঘ চোখে তার কাজল বুলাক,
ঝড়ের শ্বসিত হ্রেষা, গূঢ়, স্থির-বিদ্যুতের মালা
উড়ন্ত কেশর, জ্বালা, বজ্রস্বর, দ্যুলোক ভুলোক:

সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে সে যে চায় দিব্য মহাদেশ
রক্তে জ্বেলে মরকত, দৃষ্টি ঘোর নীলকান্তমণি,
দুইটি ডানায় মাথা শেষহীন অখণ্ড নিমেষ,
মানুষ প্রসন্ন, মাটি প্রসন্ন, জীবন, জন্ম-ধ্বনি,
সে যে দেখি উড়ে যায়, স্বপ্নময় দূরে, দিগন্তরে,
শব্দের বিদ্যুৎছটা ভ'রে দিয়ে শূন্যের প্রান্তরে॥

নীলকণ্ঠ

[বিমলচন্দ্রের অর্ধশতাব্দীপূর্তিতে]

দুর্গাদাস সরকার

তুমি কবি নীলকণ্ঠ। বিষভাণ্ডে অকুণ্ঠ পিপাসা
তোমার নিবৃত্ত হয়। দৈন্যে দুঃখে আঘাতে আঘাতে
নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে তোল সংঘাত-সম্পাতে।
নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে অফুরন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা
উদাত্ত যে কাব্যে জাগে, তাতে কী আশ্চর্য ভালবাসা
বুভুক্ষু বিষণ্ণ নগ্ন মানুষের প্রতি! ক্ষত খাতে
প্রাণের প্রবাহে নামে কী অমৃত! বিক্ষুব্ধ প্রপাতে
সৃষ্টির বিভবে চূর্ণ তুমি দীর্ণ মানুষের আশা।

তুমি কবি নীলকণ্ঠ। তোমাকেও বুঝেছি কি ঠিক?
যে-আলোয পথ হাঁটি সে-আলোর উৎসের সন্ধানে
কবে কে গিয়েছি? তবু অমৃতের আমরা শরিক
বুঝেছি এখন। আজ উচ্চকিত তোমারি সম্মানে।
আমরা দ্রাঢ়িষ্ঠ হবো, হবে শক্ত মানুষের ভিত.
তুমি কবি নীলকণ্ঠ—পৃথিবীর শ্যামল হরিত।

কবি সার্বভৌম

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এখনো একটি হাওয়া রিক্ত এই রাত্রির প্রান্তরে
জীবনের গান গায়। এখনো একটি নদী সমুদ্রের দিকে
হৃদয় উজাড় করে জল ঢালে। একটি আরণ্য কণ্ঠ সময়ের ঝড়ে
উদাত্ত ঐশ্বর্যে স্থির—জীবনের ধ্যানমন্ত্র তার প্রতি শ্লোকের গৈরিকে।
সে এক আশ্চর্য সত্তা—সামুদ্রিক স্বপ্ন নিয়ে জাগে
আজকের অজ্ঞাতবাসে; বুকে তার কুরুক্ষেত্র জয়।
জীবনের ভালোবাসা রঙ ঢালে তার প্রতি প্রাণের সংলাপে।
আর এক শান্তির তীর্থে কী এক গভীর অনুরাগে
এখনো সে পথ হাঁটে—সে জানে রাত্রির শেষে আরো এক আলোর বিস্ময়
লাল সূর্যে সমর্পিত। তাই তার চেতনার নিহিত উত্তাপে
রাত্রিকে শিয়রে রেখে শেষ সত্য উচ্চারণ করে।
দুঃখকে দুপায়ে দলে এখনো চলেছে যারা শান্তির সৈনিক
মুগ্ধ মন্ত্র শোনে তার—অতন্দ্র আত্মীয় স্বর রাত্রির তৃতীয় প্রহরে।

আকণ্ঠ দারিদ্র্য পানে নীলকণ্ঠ, তবু এই জীবন-সরিক,
জীবনকে ভালোবাসে। আজন্ম এ পৃথিবী—প্রেমিক।

সেই প্রেম বুকে করে এখনো সে জল ঢালে কঠিন ধূসরে
উপনিবেশের শেষ শোষণে শোষিত রিক্ত মৃত্তিকার প্রতি স্তরে স্তরে
সৃষ্টির সমিধ রাখে—পললে প্রস্তরে আনে মুক্তির প্রেরণা,
সমুদ্র-সূর্যের স্বাদ; ভাষা পায় হৃদয়ের রক্তাক্ত চেতনা।

আশ্বিনের আলো-ঢালা শিশিরের সবুজ প্রান্তর—
উজ্জ্বল আনন্দ-শান্তি-মুগ্ধ মুখ—ভালোবাসা ভরা এ সংসার
তার সে হৃদয়ে ব্যাপ্ত। তাই সে প্রাণের উৎস পঞ্চাশেও দৃপ্ত মুখর,
তাই সে উদ্দাম হাওয়া ভেঙে পড়ে বার বার—আমাদের মৃত অন্ধকার
আবেগে উদ্দীপ্ত হয়! তোমার দুচোখে আমরা দেখি এক
সোনা-ঢালা শান্তির প্রসার॥

তোমার জন্মের স্রোতে

ধনঞ্জয় দাশ

মনের আকাশে দেখি অনেক নক্ষত্র পথ হাঁটে
অন্ধকারে প্রেমকে নাচায়
কামনার নদী টলে মধুময় সংসারের ঘাটে
যাদুকণ্ঠ পাখি গান গায়।

তবে এ নিরন্ন হাওয়া কেন ছোটে, কেন দীর্ঘশ্বাস
ক্লান্তি, মৃত্যু, শুকনো ফুল—কেন বারোমাস?
ঘরে ঘরে ধ্বংসের প্রতিমা গড়ে
মেঘের জটায় ঢাকে আলোর আকাশ!

অন্তহীন এ-জিজ্ঞাসা যেন এক রক্তমাখা বাঘ
অন্ধ রাগে অরণ্য কাঁপায়
তোমার জন্মের স্রোতে তবু কী উজ্জ্বল এক ঝাঁক
রুপালি মাছেরা ঘুরে মরে যন্ত্রণায়॥

ব্যর্থ-পলাশ

সুকুমার ঘোষ

[কবির পঞ্চাশপূর্তিতে]

রক্তগোলাপে মদির গন্ধ আছে
আমার পলাশে নেশাই আগুন! আগুন!
তোমার উষ্ণ রক্তের জৌলুষে
একটা রুমাল ভিজুক, অনেক দামী।

আমার এমন ব্যর্থ-ব্যথিত বুকে
অজস্র ভীড় হাহাকারে উন্মনা
দীর্ঘশ্বাসের মোচড়ে ফুলকি ওঠে
তোমার রক্তে ছাই হ'য়ে একমুঠি
থাকতে তবুও দ্বিধা নেই—নিভে গেলে।

তোমাকে অপার ভালবাসা। হিংসাতে
বাধা হ'য়ে নয়। দূরও নেই নেই--
তোমার অনেক আগেই
আমার মৃত্যু জ্বালা জুড়োনোর ধ্বংসস্তূপের শান্তি।

তুমি জানবে না কেউ জানবে না জীবনের চিতা জ্বলছে
বহ্নি-পলাশ অজান্তে নিভে যাবে!
তোমার স্পর্শ যেন একমুঠো আমার ছাইতে থাকে।

চেনা মাটি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এ আমার চেনা মাটি, এইখানে ছড়ায় শিকড়
আমার সহজ সত্তা, একান্ত আত্মীয় পরিবেশ
গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি অন্তরঙ্গ আলাপী আসর
হৃদ্যতার উত্তাপেই বিষাদের শীত নিরুদ্দেশ।
হৃদয়ে মল্লিকাবনে তাই যে প্রথম ধরে কলি
হিমেল আকাশে ঝরে বসন্তের কবোষ্ণ নিঃশ্বাস,
মরীয়া আবেগে জ্বালে পলাশেরা বাঁচার আশ্বাস—
রক্তরাঙা ক'টি ফুলে এ পৃথিবী বেঁধেছে অঞ্জলি।

আমরা সবাই মুগ্ধ পটভূমি প্রকৃতি সমাজে
যেখানে মানুষ সব দীর্ঘ বনস্পতির মতন
মাথা উঁচু ক'রে বাঁচে, কোলে তা'র বাড়ে শিশু চারা,
পরস্পর সাহচর্যে শীত কিম্বা মৃত্যুর পাহারা
তুচ্ছ করে ফুলে ফলে অবিশ্রাম আনন্দের কাজে
যেন নিত্য জন্মদিনে ফিরে পায় প্রাণের স্পন্দন।

জন্ম হতে অন্য জন্মে

তরুণ সান্যাল

সকলেই বাঁচতে চাই, কিন্তু জানি সবাই বাঁচবো না,
কেউ নক্ষত্রের পথে যেতে হব উল্কাখসা ছাই
কেউ রাংতা হ'তে হব সময়ের সারাৎসার সোনা
কেউ নিয়ে যাব অঙ্গে শতাব্দীর যন্ত্রণা বালাই।
তবু কেউ জীবনেব নদী কিংবা মোহানায় আছে,
ফুল ফোটাবার আগে যদিও উদ্যান মরে যায়
ঝরে যাক, মনে রাখি নিদাঘেও শ্লথপত্র গাছে
বিচিত্র আনন্দ রাখে কেউ কেউ, কুসুম ফোটায়।

শুধাই, সময কার করতলে পৃথিবী ধারণে
অঙ্গীকার দিতে চাও, চতুর্দিকে দ্রুতগতি ঢেউ
জটিল ফেনার মালা, কিন্তু লোনা বক্ষে রাখে ধরে,
ধ্বস্ত উদ্যানের কোলে বীজের গৌরব উচ্চারণে
একবিংশ শতকের উদ্যানের চিহ্ন দেখে কেউ,
কে পড় কবিতা তার, আজি হতে শতবর্ষ পরে॥

কাব্যলোক

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে]

প্রজ্ঞার প্রদ্যুতি নিয়ে লীলা-বিলাসের জানি ছন্দ
একটি গভীরতর জীবন-বেদের সুক্তে স্থির,—
কঠিন বাস্তব-সত্যে অনুভূতি বিমল-নিবিড়
চন্দ্রীয় জ্যোতির্লোকে জ্যোৎস্নার ধারায় স্বচ্ছন্দ॥
পঞ্চাশ-বসন্ত-ঘ্রাণ অভিষিক্ত প্রাণে অভিজ্ঞান
সোনালী বালুকা বেলা শাশ্বত মনের সুসন্ধান,
চঞ্চল কামনা কত; একটি অপূর্ব তবু দ্যুতি
প্রজ্জ্বলিত সমাজের কর্তব্যের চির-অনুভূতি।

উজ্জ্বল আদর্শবদ্ধ, মোহময় শুধু নয় খেলা;
মেঘের মতই দেখা চলার আকাশে আসে আসে,—
নিষ্ঠার প্রকোষ্ঠে জানি বেদনার গাঢ় রঙ ভাসে
তবু মন বার বার কাব্যলোকে খোঁজে প্রিয়মেলা।
বাণীর দেউল তীরে বসে বসে ধীর রোমন্থন,
হৃদয়-উত্তাপে যত হাজারো রত্নের আহরণ॥

অনির্বাণ

অরুণকুমার ভট্টাচার্য

আঁধারে অর্ধশতাব্দী গেল কেটে
দুর্জয় অভিমানে,
যে বিস্ফোরক বেরোয় পাথর ফেটে
তোমার কাব্যে গানে,
সে তোমার কবি-প্রতিভার প্রাণবহ্নি
নাচে শিখরিণী নর্তনী শিখাতন্বী
দ্যুতি-সৌরভ-গৌরবে শতপর্ণী
দীপ্ত বর্তমানে,
হে কাল-বিজয়ী পঞ্চাশ গেল কেটে
মুক্তির সন্ধানে॥

নবচেতনার প্রাণঝঙ্কার তুমি
ক্ষয়িষ্ণু যুগাবর্তে,
আপাতগর্বে ক্ষণপ্রতিষ্ঠাভূমি
চাওনি ঘৃণ্য সর্তে!
শ্রমিকপ্রাণের হে অনির্বাণ সূর্য
শুনেছি তোমার বিপ্লবী রণতূর্য
হৃদয়ে স্বাতীর কান্নার বৈদূর্য
প্রেমবিহ্বল প্রাণে!
শুনেছি তোমার ঝঙ্কার মৌসুমী
সাগর-দোলানো গানে॥

কবি-প্রণাম

নিশিকান্ত সিদ্ধান্তবিশারদ

[বিমলচন্দ্র ঘোষ পূজ্যপাদেষু]

এখানে গ্রামের বুকে রোদ-জল-ঝরা ভাঙা ঘরে
আমি এক একলব্য শম্বুকের উত্তরাধিকারী
যুগান্তের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনারে বারংবার স্মরি
সাম্যের স্বপন দেখি নিরুপায় ক্ষুধিত জঠরে।
হেনকালে পশে কর্ণে বীর্যবন্ত উদাত্ত কণ্ঠের
তোমার ঘোষণা-গাথা, অপরূপ ভাষা ছন্দোময়
পীড়িত-দলিত-সর্বহারাদের দানিতে অভয়—
শোণিত-সোনায় লেখা প্রেমময় বাণী হৃদয়ের।

'ভুখা ভারতের' কবি 'উদাত্ত ভারত' রচয়িতা
আত্মার আত্মীয় তুমি দুনিয়ার শোষিতজনের
যমের প্রাসাদে তব সাবিত্রীর কাব্যরথ চলে
কালের কবলে মৃত সত্যবানে দিতে প্রাণ দান।
তাই তব পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি সম্বর্ধনা দিনে
স্নেহঋণে ধন্য হই প্রণতি জানায়ে পদতলে।

* প্রচারক, বঙ্গীয় হরিজন সেবক সংঘ : বসর ২৪ পরগণা। ইনি একজন চারণ-কবি।

আশ্চর্য! আমরা আজো বেঁচে আছি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রদ্ধাস্পদেষু]

আশ্চর্য! আমরা আজো বেঁচে আছি, এবং দু'চোখে
এখনও নিঃসীম স্বপ্নসাধ কিংবা প্রত্যাশা নিবিড়।
এখনও বন্ধুকে কাছে পেতে চাই, মাতাল অস্থির—
অবাধ্য দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছি দুখে কিংবা শোকে।
আশ্চর্য! এখনো আমি মুগ্ধ চোখে প্রেমিকের মত—
প্রসারিত করতলে হে নারী! তোমাকে পেতে চাই।
এখনো প্রতিষ্ঠ প্রেমে। অন্ধকারে আজো হাতড়াই
একদা বিশ্বস্ত রাখী, আজো ভাবি তেমনি অক্ষত।

দৈবাৎ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী পরিচয় হ'লে
এখনও বিস্মিত হই। ভয় পাই। অথচ প্রত্যহ
অজস্র বিচ্ছিন্ন মৃত্যু খেলা করছে নিয়ে অহরহ
নিপুণ শিল্পীর মত রাজপথে, অন্দরমহলে।
আশ্চর্য! আমরা আজো বেঁচে আছি, এবং দু'চোখে
এখনও নিঃসীম স্বপ্ন জ্বলে ওঠে দুখে কিংবা শোকে।

যুগচেতনার জ্যোতিষ্ক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[কবিবর শ্রীবিমলচন্দ্রকে]

তোমার আমার প্রেম জানি না তো কত শতাব্দীর,
কত যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত মধুময় স্মৃতি!
হৃদয় যখনি হয় মোহগ্রাসে উন্মত্ত অধীর
তোমারি প্রশান্ত মুখে, শুনি শুধু প্রীতিমুগ্ধ গীতি।
কাব্যিক মানসে মোর আনন্দের তুমি হৈমশিলা
ভাবনার গতিপথে চিরমুক্ত তুমি নির্ঝরিণী,
অনন্ত সাগরবক্ষে চলে তাই তব বিশ্বলীলা
যেন কোন্ সাম্রাজ্যের উদ্দীপিত লক্ষ অক্ষৌহিনী!

সভ্যতার ইতিহাসে চৈতন্যের তুমি অগ্রদূত,
প্রেরণার উৎস তুমি। চিদাকাশে সূর্য সদাস্থির
সিদ্ধির সমাপ্তি তুমি। যুগান্তের অলঙ্ঘ্য অর্বুদ
ঋদ্ধির পুরোধা তুমি। মিলনের সুদীর্ঘ মন্দির।
দিগন্তের শঙ্খ আজ বাজে ওই জয়ধ্বনিময়—
এ মাহেন্দ্রক্ষণে লহ, ক্ষুদ্র মোর প্রাণের সঞ্চয়।

চিরন্তন

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

[বিমলচন্দ্রের ৫০তম জন্মদিনে]

আমরা এসেছি হাজারে হাজারে প্রাণের নিমন্ত্রণে
নীল সাগরের বুকে ভেসে-আসা শুভ্র ফেনার মত,
অধীর দু'চোখ আমরা মেলেছি লক্ষ তারার পানে
সাগরের গান আমরা শুনেছি কান পেতে অবিরত।
প্রপিতামহের পায়ের চিহ্ন খুঁজেছি মাটির বুকে
মুঠিভরা এর নাগরিক-ধুলো পলকে করেছি সোনা
বৃদ্ধা প্রপিতামহী এ-মাটিতে তবুও সকৌতুকে
সাঙ্গ করেছি কখন আবার ঘুমের গল্প শোনা।

এই গল্প তো এখনো চলবে হাজার বছর ধরে,
সকালের রোদ তাই তো আকাশে প্রজাপতি হ'য়ে ফোটে,-
প্রত্যহ এই জীবন-জন্মে এ মাটির খেলাঘরে,
তোমার চেতনা ফুলের মতোই ঝলমল ফুটে ওঠে।

কিছুই আশ্চর্য নয়

অসীম সেনগুপ্ত

[বিমলচন্দ্রের পঞ্চাশপূর্তিতে]

কিছুই আশ্চর্য নয়, এই আলো এই অন্ধকারে;
চন্দ্র-সূর্য-তারা আর শব্দহীন স্তব্ধতার দেহ।
পুরানো ঘরের দরজা খুলে এই পৃথিবীর পারে
প্রতিদিন জন্ম নেব, ইচ্ছে হয়, সময় পাই না।
যন্ত্রণার দীর্ঘ দহে ডুবে আছে জীবনের স্নেহ;—
কে তুমি তলিয়ে যাচ্ছ ছায়া ছায়া অস্পষ্ট মুখ।
আমি যত বৃদ্ধ হই, পৃথিবীতে তত পরবাসী
গাছপালা ফুল ফল সমস্ত স্মৃতির মত লাগে।'

আমরা অস্তিত্ব নই। সীমাহীন শূন্যতার তলে
ছোট ছোট রুদ্ধ ঘর। তারি মাঝে দুরন্ত শীতল
জ্বলছে বিষম ধাতু মৃত চাঁদ মৃত তারা আর
এক লক্ষ ভয় নিয়ে, আমাকে ছিনিয়ে নেবে বলে।
পৃথিবীকে চেয়ে দেখি, চারিদিকে আমাদেরি আয়ু,
ইচ্ছে করে ভালবাসি,--হে জীবন, সময় পাই না।'

অগ্নিহোত্রীকে

সুখেন্দু পুরকাইত

[কবি বিমলচন্দ্রের ৫০তম জন্মদিনে]

আলোর হাতছানি আমাকে ডাকছে।
তাকে পাবো ব'লে তমিস্রার গর্ভকোষে
অনন্তকাল ঘুরে ঘুরে......ঘুরে ঘুরে......
অংকুরের চোখে উদ্গমের তৃষ্ণা!

নির্মোকের অন্তরালে জ্যোতির্ময় দিনের মুখ দেখার স্বপ্ন!
দিন যায় মাস যায়। বছরের পর বছর আসে
আমি ঘুরে ঘুরে......ঘুরে ঘুরে......
অন্ধকার সমুদ্রের অথৈ গভীরে উজান ঠেলছি।
প্রাণের প্রতিকূলে যন্ত্রণার বিষবাষ্পে অফুরন্ত অন্ধকারের কীট!
হে জীবন, একটু দাঁড়াও, তোমার সাগ্নিক প্রেমের মর্মমূলে
আমার প্রাণময়-সত্তার মশাল জ্বালবো।

আলোর হাতছানি আমাকে ডাকছে।
তাকে পাবো ব'লে কোনো অন্ধকারের গহ্বর থেকে
আমি আসছি,. ....আমি আসছি।

উদাত্ত সুরে গাও গান আরো গান

ভোলানাথ ঘোষ

আকাশ যে চায় আরো আলো আরো আলো!
বাতাসে আকুতি : আরো গান আরো গান;
পৃথিবীর চোখে এখনো ধূমের কালো,
আঁধারে গোঙায় কত ভ্রূণ বোবা প্রাণ।

প্রাসাদ ভগ্ন, ফাটলে ফোকরে তা'র
আজো হিলিবিলি কালকেউটের ফণা,
হিমেল হিংসা বাঁকা দাঁতে ক্ষুরধার
সুদের উশুল ফসলের শেষ কণা।

শীর্ণ রক্তে নিরাশায় শীতলতা
আজো চায় তাপ, উজ্জ্বল সাদা রোদ,
'লোহার খাঁচায়' কুটিল নিষ্ঠুরতা
লাস-কাটা ছুরি; নেইকো মমতাবোধ।

পাথরের তলে ফ্যাকাসে ঘাসের মুখে
বেঁচে-মরে-থাকা জীবনের ইতিহাস
শোষিত পাংশু ক্রূর আঁধারের বুকে
এখনো যে বাকী অনেক হিসাব নিকাশ!

তাই চাই আলো, আরো আলো প্রীতিঝরা
কালো-ছিঁড়ে-দেওয়া রৌদ্রের অভিযান
আরো ভালোবাসা রিক্তে, দরদভরা
উদাত্ত সুরে গাও গান,—আরো গান!

জন্মদিন-মৃত্যুদিন

মৃণালকান্তি দত্ত

অন্ধকার কালো ব'লে পৃথিবীর দিনগুলি অনন্ত আলোয়
উদ্ভাসিত; সময়ের অকৃপণ প্রশান্ত প্রণম
অন্ধকার ভালো ব'লে আমাদের দ্রুতগতি মেয়াদী জীবনে
জন্মদিন-মৃত্যুদিন নদী আর সমুদ্র-সঙ্গম।

তবুও সঙ্গম থেকে উৎসারিত কেন্দ্রাবিন্দু নিয়ে চলে যায়
স্বগত ইচ্ছার বৃত্তে; কৈশোরের আশীর্ণ সরণী
বেলাভূমি ছুঁয়ে যায়; আরেকবার পরিত্যক্ত অনচ্ছ শৈশবে
ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। চিরন্তন কালের পাটনী
যদিও সংকেত করে নিঃশব্দ দুয়ার প্রান্তে, তথাপি বিলাপে
বঞ্চিত করার চেয়ে জন্মলগ্ন ফিরে পাই ভৈরবী আলাপে।

অন্ধকার দর্পণে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার আরো কিছু বাকী রেখেছিল।
কোন কথা বলার অতীতে বিস্ময়
অনুগত অন্ধকার বানালো জোনাকি।
সন্ধ্যার শিয়রে অভ্যাস-সমর্পিত অবক্ষয়।
বিকেলের সিঁড়িকার আলো ছায়া মাপে।

ক্লান্ত পথ কখনো একাকী
ত্রস্ত বাঁকে মোড় নেয়। সময়ের প্রবীণ নির্দেশ
কোন ছায়া-উপকণ্ঠে আলোর নির্ভয়।

সময়ের জানালায় অবলুপ্ত থাকি
প্রতীক্ষার ধূপে। তবু স্পষ্ট ব্যবধান সময় নেভালো
আকৃতির শিখা। প্রস্তাবিত পথের নিশ্চয়
হয়ত বাড়ালো হাত। অবিচল আলোর আশ্লেষ।
স্তব্ধতায় সমাকীর্ণ মনের সংশয়
কোনো চোখে কৌতূহল টেনে দেবে নাকি
কাজল। কাজল কিম্বা রাত্রির ক্লেশ
অন্ধকার দর্পণে অবিচল আলোর আশ্লেষ :

সম্ভাবিত

শ্যামসুন্দর দে

[পঞ্চাশপূর্তিতে]

আরো একটুখানি আলো চেয়েছিল,
সকালের অনিন্দ্য রোদে
সূর্যমুখী সূর্যের দিকে চেয়েছিল।

কাল সারারাত আকাশে কি বিপুল কানাকানি
নক্ষত্রের ছুটোছুটি আলোর ক্ষুদ্র সঞ্চয় হাতে নিয়ে।
তারপর কত পথ-পরিক্রমার শেষে
সূর্যের দরজায় ঘা দিল।

আরো একটু আলো চেয়েছিল
রোদের কণাগুলোর উদ্দাম স্রোত
ইথারের স্তরে বিকিরণ।
গোলাপের কুঁড়িগুলোর নিভৃত বাসনা
রঙের উজ্জ্বলতা, আলোর গভীরে।
সূর্যের কণাগুলো আরো কি আলো ছড়ালে,
সৃজনের সম্ভাবনায় মৃত্তিকার শিহরণ॥

নমস্কার

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

হে কবি তোমার কাব্যলোকের কঠিন সাধনাপথে
অসুন্দরের বিঘ্ন এসেছে কত ভাবে কত মতে।
ক্রূর অনশন অপমান ব্যাধি দারিদ্র্য সন্তাপ
আঘাত হেনেছে বারে বারে কত নেই যার পরিমাপ;
তবু তুমি আজো হিমাদ্রী সম অটল উচ্চশির
মহান কাব্য-সাধনায় রত অর্ধশতাব্দীর।
বিপ্লবী মনোবাসনা-দেউলে সান্দ্র, তিমির রাতে
সর্বহারার গান গেয়ে চল আগ্নেয় বীণা হাতে।

ধূপের মতন আপনারে তুমি তিলে তিলে করো ক্ষয়
অকৃপণ প্রেমে ছড়াও সুরভি নিখিল বিশ্বময়।
অসত্যে পদদলিত করেছ হে চির অনমনীয়
হে সত্যবান, তাই তুমি আজ বাংলার বরণীয়।
চিরজীবি হও! অবসান হোক সকল যন্ত্রণার!
চিরশান্তির পূজারী যে তুমি, তোমায় নমস্কার।

মানুষের কবি বিমলচন্দ্রকে

বীরেন্দ্রনাথ বসু

তোমাকে দেখেছি আমি বহুদিন বহুতর রূপে
দুপুরের খর রোদে, অন্ধকার রাত্রে চুপে চুপে
দাঁড়িয়েছো পাশে এসে। স্নেহ নিয়ে আত্মীয়জনের
ভাষা নিয়ে দুঃখনম্র মানুষের নির্বাক মনের।
পৃথিবীকে ভালবেসে বরণ করেছ দুঃখ-কারা
লোভের সরণি থেকে সরে এলে। খ্যাতির পসরা
ধূলোয় নামিয়ে রেখে। অন্ধ-বিশ্বাসের পথ থেকে
বুদ্ধিকে দিয়েছ মুক্তি প্রগতির দীপ জেবলে রেখে।

দুঃখভারে জর্জরিত পৃথিবীর আর্ত যন্ত্রণার
বাণীরূপ দিলে তুমি, কবি তুমি, তুমি রূপকার।
তোমার আকাশে জবলে বেদনা-পান্ডুর স্বাতী তারা
অশ্রুমুখী। দেখোনিকো উর্বশীর বঙ্কিম ইশারা
তোমার প্রাণেতে ঢেউ তোলেনিকো কোনোদিন জানি
অস্থির হয়েছ শুনে বঞ্চিতের অস্ফুট গোঙানি।

নীলকণ্ঠ

[বিমলচন্দ্র ঘোষ শ্রদ্ধাস্পদেষু]

পরিমল চক্রবর্তী

কেন বিষ পান করে তুমি আজ নীলকণ্ঠ হলে?

তোমার জীবন যেন অত্যাশ্চর্য এক শিল্পলিপি;
যত পড়ি তত ভাবি অলৌকিক এ কোন্ খেয়ালে
তুমি গাঢ় ছায়া ফেলো চেতনার দেয়ালে দেয়ালে!
(ঘুমন্ত স্বপ্নেরা সব জেগে উঠে অভিজ্ঞান-লিপি
খুঁজে পায়;) বাসনার বেদনার যত প্রতিভাস
রেখে গেলে কবিতায় কবিতায় আর গানে গানে,
সমস্তই আমাদের প্রাণের সম্পদ; অনুধ্যানে
আমি যে সতত শুনি তোমার সে আর্তির বিভাস।

কেন বিষ পান করে আজ তুমি নীলকণ্ঠ হলে?

॥ কবির্মণীষীপরিভূঃ স্বয়ম্ভূ ॥

রঙ্গনাথ রাকেশ*

ম্যয়্‌নে তুম্‌হে দেখা থা : কবিসাগ্নিক হে!
বিদ্রোহ্ অওর্ নব্যচেতনাকে জীবন্ত্-অমিতাভ!
হে অর্ধশতাব্দীকে বাসন্তেয় বজ্রপুষ্প
তুম্‌হারা বীর্যবান্ সৌরভ বাঁধ্ রহা হ্যায়—
ম্রিয়মানা প্রাচীনা ধরিত্রীকে বন্ধ্যা কুক্ষিমে
(শাপভ্রষ্টা প্রস্তরীভূতা অহল্যা কী কায়া কো)
সর্বহারা সভ্যতা কী সন্তানে কম্পমান
কোটি কোটি কল্পবৃক্ষ তুম্‌হারে লৌহছন্দো মে
ফুট রহে : হংস রহে লহলহাতে শস্যশীর্ষ॥

হে হিরণ্যগর্ভেয় লৌহপুরুষ, বজ্রকায় মাতরিশ্বান্!
রক্তাভ হীরক পাটলকে চক্রবাল শুভ্র-সার
জনগণ-মনকে স্তোত্রময় প্রতীক তুম্
আয়ত্ আকাশ অওর্ লৌহস্বরোঁকে কবি
ম্যর তুম্‌হে প্রণমাঞ্জলিয়াঁ দেতা হুঁ অনুজেয়॥

* অধ্যাপক রাকেশ একজন শক্তিশালী আধুনিক হিন্দী কবি ও কাব্য-সমালোচক।

সমসাময়িকদের চোখে বিমলচন্দ্র

আশিস্ সান্যাল

"The Poet is not a contemporary, but an eternal man."
—*EMERSON*.

মহৎ কবিরা শুধু সমসাময়িক কালের নন, তাঁরা সর্বকালের। তবু সমসাময়িকরা তাঁদের কি চোখে দেখেছিলেন, কতখানি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এ-সব কথা জানবার জন্যে পাঠক-পাঠিকার কৌতূহলের অন্ত নেই। কবিমানসের ক্রমপরিণতির প্রতিটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অধ্যায়, অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র সংবেদনশীলতার উত্থান-পতনে সংঘাতময়। এই ক্রমপরিণতির অদৃশ্য কার্য-কারণগুলির সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিশ্লেষণের দুরূহ কাজে যদিও কবির সৃজিত কবিতাবলীই প্রধান অবলম্বন, তবুও কবির জীবন-বৈচিত্র্য ও তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময়ের অভিমতগুলিও বিপুলভাবে সহায়তা করে। মুকুল-পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত পূর্ণ পরিণত বনস্পতির দিকে তাকিয়ে তার আদিম বীজসত্তার কথা দর্শকের মনে থাকে না। কবি-সাহিত্যিকের পূর্ণমানসও ঠিক এই বীজ থেকে বনস্পতির উদ্ভাসিত বিপুল পরিণতির মতোই বিস্ময়কর।

কবির অনলস কাব্য-সাধনার সিদ্ধিই হ'ল তাঁর সার্থক কবিতাবলী। সিদ্ধি কিন্তু এ সাধনার শেষ স্তর নয়। সিদ্ধি হ'ল চির অতৃপ্ত সৃজনী প্রতিভার ক্ষণ-বিরামভূমি, সাধনার একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রান্তরেখা। নিত্য নূতন উন্মেষ-পিপাসু কবিপ্রতিভা যে প্রান্তরেখায় ক্ষণক্লান্তচিত্তে থমকে দাঁড়ায়, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে--কতদূর? আরো কতদূর? কবির যেমন তৃপ্তি নেই, পাঠকেরও অতৃপ্তি তেমনি সীমাহীন। সে বলে আরো দাও, আরো শোনাও! সেই সঙ্গে সঙ্গে সে জানতে চায়, কেমন ক'রে তুমি কবি হ'লে? কোন্ প্রতি-কূল আর অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তোমার কবিমানস পূর্ণৈশ্বর্যে বিকশিত হ'ল? এ সব প্রশ্নের উত্তর হয় কবিকে, নয় তাঁর ব্যাখ্যাকার ও জীবনীকারকে দিতে হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক মহৎ কবির কাব্যসাধনার ধারা-বাহিকতার সঙ্গে, তাঁর দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কবির শুধু কাব্য নয়, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাধনার স্তরগুলি সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা জানবার জন্যে পাঠকসমাজের এত কৌতূহল!

কাব্যরসিক পাঠকসমাজের এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শক্তিমান জাতীয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাব্য-সাধনার ক্রমবিকাশ ও বিদগ্ধসমাজে তাঁর ক্রমপ্রতিষ্ঠার একটি মূল্যবান তথ্যাবলী এখানে সন্নিবেশিত করা হ'ল। কবির কাছে সযত্নে রক্ষিত অসংখ্য পুরনো কাগজপত্র অনুসন্ধান ক'রে—যথাসম্ভব সন তারিখ মিলিয়ে এগুলি সংকলিত। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, সমালোচনা ও ব্যক্তিগত শত শত চিঠিপত্রের মধ্যে থেকে এই অভিমতগুলি কবি ও কবির কালানুক্রমিক কাব্যকৃতির প্রকৃত মূল্য নিরূপণে সহায়তা করবে।

উনিশ-কুড়ি বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বিমলচন্দ্রের কবি-জীবনের এই তিরিশ বছরকে তিনটি ক্রমপ্রসারিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১৯৩১ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বেদান্ত ও ভাববাদী হেগেলের সংমিশ্রণ, ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সালের প্রথম দু'এক বছর প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে আর্ত কলাকৈবল্যবাদী মনন এবং পরবর্তী আট-নয় বছর বস্তুবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তার অনুগামী, ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল অর্থাৎ বর্তমান কাল, মার্ক্সীয় সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত ভাবধারায় সমৃদ্ধ বিমলচন্দ্রের কবিজীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল। এই তিনটি পর্যায়ের বিভিন্ন সময়ে বিমলচন্দ্র সমসাময়িকদের কাছে কতখানি স্বীকৃতি পেয়েছেন তা'র নিদর্শনগুলি এখানে কালানুক্রমিকভাবে উদ্ধৃত করা হ'ল :

॥ কাব্য-সাধনার প্রথম দশক ঃ ১৯৩১-১৯৪০ ॥

বিমলচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "জীবন ও রাত্রি" পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু তোমার 'জীবন ও রাত্রি' পেয়েছি। তোমার কাব্যসাধনা সফল হোক এই কামনা করি— যে শক্তি তোমার মধ্যে আছে সময়ে তার বিকাশ হোক।

ইতি ১১।১০।৩৮

শুভৈষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅরবিন্দ

বিমলচন্দ্রের একটিমাত্র কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীদিলীপকুমার রায় আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে একখানি সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার চিঠিতে কবিকে অভিনন্দিত করেন। এই চিঠিতে শ্রীদিলীপকুমার লেখেন, "—শুনে সুখী

হবেন শ্রীঅরবিন্দ আপনার কবিতাটি ও পত্রটি পড়ে লিখেছেন : "I like the poem very, well, and there are very fine lines in it."

—পণ্ডিচেরি : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৬

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত তোমার "নীহারিকা", "সৃষ্টি" ও "মহাপ্রলয়" শীর্ষক তিনটি কবিতা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এতদিনে তোমার সুগভীর নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারে ধর্মগ্রন্থাপি পাঠ সার্থক হইয়াছে। কবিতাগুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দ অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। বিবেক-জ্ঞানের পথে অবিচল থাকিলে তোমার কবিত্বশক্তি নব নব উন্মেষে লোক-প্রিয়তা অর্জন করিবে। আশীর্বাদ করি শ্রীভগবানের কৃপায় তোমার সত্য ও সুন্দরের সাধনা জয়যুক্ত হউক।

—ভাগবত চতুষ্পাঠী : ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০

বিনয়কুমার সরকার

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব দার্শনিক সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দ এক-খানি চিঠিতে লেখেন : তোমার 'সারথি' কবিতাটি পড়িয়া অধ্যাপক বিনয় সরকার বলিযাছেন, "এতখানি জোরালো আওয়াজ নজরুল ছাড়া এ-যুগে আর কারুর কবিতায় শুনি নি। পরাধীনতার জ্বালায় এই তরুণ কবি বন্দী বাঘেব মতো গর্জেছে।" কিন্তু এ কবিতা এখন প্রকাশ করা যাইবে না। অন্য একটি কবিতা সত্বর পাঠাইয়া দিবে।

—উদ্বোধন আপিস : ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যখন 'দেশ' নামক অধুনাবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন, তখন উক্ত পত্রিকার পক্ষ থেকে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় বিমলচন্দ্রকে লেখেন : "আপনার কবিতাগুলির মধ্যে নিপীড়িত মানবের অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "দেশ" এইপ্রকার কবিতা আপনার নিকট হইতে আরও আশা করে। অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। নমস্কার জানিবেন।"

—'দেশ' কার্যালয় : ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩

মোহিতলাল মজুমদার

"আপনার 'জীবন ও রাত্রি' পাইয়াছি এবং কয়েকটি কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার পত্রখানিও অতি সুন্দর।......আমি এইজন্য সুখী হইয়াছি যে আপনার মত একজন অতি আধুনিক নিম্নভূমির সহজ অবতরণ পথ ত্যাগ করিয়া আমার মত দুর্গম পথযাত্রীর হস্তধৃত পতাকার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। মন ও প্রাণ এই দুইয়ের মিলিত ও একাগ্র কর্ষণে আপনার কাব্য সাধনার পথ প্রশস্ত ও সুগম হউক।"

—পত্রাংশ : ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৮

স্বামী সুন্দরানন্দ

"গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'উদ্বোধন' পত্রে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা প্রকাশিত হইতেছে। এই কবিতাগুলি ছন্দে, ভাষামাধুর্যে, ভাব-ব্যঞ্জনায় ও রূপদ্যোতনায় পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনবিধান করিয়াছে। অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যসৃষ্টি কবিতাগুলির বৈশিষ্ট।..."

—৩রা মাঘ, ১৩৪৩

J. K. BISWAS, J.P.

Bimal Chandra Ghosh's writings have made a deep impression on me. His poems are as original in thought as they are in rhythm. He appears to have developed his thoughts in verse in a manner which is novel and striking, and I believe he is one of the younger poets who will make his mark in contemporary Bengali Literature. The rich imagery of language and his extensive vocabulary—picturesque and at the same time convincing and masterful give him the power to enthral and inspire. My congratulation to the young poet. —13*th March* 1939

কাব্য-সাধনার দ্বিতীয় দশক ঃ ১৯৪১-৫০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"একটা বড় আদর্শ ও বাস্তবের টানা-পোড়েনে 'দক্ষিণায়ণে'র জমিটা খাপি। বিষয়ের গাম্ভীর্য এখানে গুরুত্ব এনেছে। বিমলচন্দ্রের মন ক্ষণিক প্রতিচ্ছায়ার অতিরিক্ত একটা স্থায়ী ভাবের খোঁজে ব্যস্ত। এটা সত্যই মূল্যবান বস্তু।"

—পরিচয় : কার্তিক, ১৩৪৮

নীহাররঞ্জন রায়

"...'দক্ষিণায়নে' এই আধুনিক মনের সার্থক কাব্যময় প্রকাশ দেখে মনখুশী হ'ল। তাঁর কবিতা এই প্রথম পড়লুম, মনে হ'ল আগে পড়ি নি কেন? অথবা পড়েও হয়তো থাকবো সাময়িক পত্রের পাতায়, কিন্তু দুটি-একটি কবিতা পড়ে কবির মনের ছবিটি ধরতে পারি নি ব'লে তা হয়তো আর মনে নেই। এখন সবগুলি কবিতা পড়ে তাঁর মনের ছবিটা সুস্পষ্ট হ'ল। বিমলবাবুর কবিপ্রেরণা সত্য ও সার্থক। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ তাঁর নিবিড়; তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও অনুভূতি গভীর, সর্বোপরি তিনি নিজের সঙ্গে কোথাও ছলনা করেন না। তাঁর বাকভঙ্গী জোরালো, শব্দের ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি সচেতন, এবং শব্দ ও কল্পনাচিত্রের ভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা, পুরাণ ঐতিহ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। আধুনিক কাল সম্বন্ধে তিনি সচেতন, তাঁর কবিমানসও সেই অনুযায়ী, কিন্তু কোথাও আধুনিক-পণার চিহ্ন পড়ে নি তাঁর কবিতায়। দক্ষিণায়ন পড়ে যথার্থ তৃপ্তি পাওয়া গেল।"

—"কবিতা" পত্রিকা : জুন ১৯৪২

সজনীকান্ত দাস

বিমলচন্দ্রের যে বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা তাঁহার সবলতা ও পৌরুষ। তাঁহার সত্যকার কবিতাগুলিতে কাব্যানুভূতি কোথাও টাল খায় নাই; বুক, মগজ এবং কলম ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। এ যুগের খুব বেশি কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

—১৩ই নভেম্বর, ১৯৪১

মোহিতলাল মজুমদার

'দক্ষিণায়ন' পড়িয়াছি। আপনার রচনার ভাষা, ভাব ও চিন্তায় দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণতার পরিচয় আছে। ফাঁকি নাই, আলস্য নাই, অপটুতা নাই। ভাষার উপরেও যথেষ্ট অধিকার আছে দেখা যায়। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও —আপনার কবিতা মনঃপ্রধান, বিতর্কমূলক, তথ্য ও তত্ত্বপ্রধান—মতবাদী। ইহাই যদি একালের কবিতা হয়—তবে আপনার কবিতা অতিশয় যুগোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং সে হিসাবে আপনি শক্তিমান। আপনার কবিতার একটি লাইন আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে :

"গৌরীশৃঙ্গ তুষারপুষ্পে মানসভৃঙ্গ মম
গুঞ্জরি গাহে জয়তু ঊর্ধ্বগতি......"

—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র বোধহয় সকলের চেয়ে মৌলিকতা দাবী করতে পারেন। তিনি একদিকে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত এবং অন্যদিকে বৈদেশিক কবিদের প্রভাব তাঁর উপর নেই বললেই চলে। তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক কিন্তু কল্পনা পৌরাণিক। এইখানে তাঁর বিশেষত্ব এবং এইখানেই তাঁর মৌলকতা। তাঁর কাব্যের মূল সুর মহাকালরূপ নটরাজের ভয়াল অথচ মনোমোহন নৃত্য। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে কালের প্রবাহে যে মহানাটক অভিনীত হচ্ছে তারই দৃশ্যবিশেষ রূপে তিনি সবকিছুকেই দেখেন। তাঁর কাব্যের ছন্দে মহাকালের নৃত্যদোলা স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাঁর কাব্যের ভাষা জলপ্রপাতের ধ্বনির মত গুরুগম্ভীর। এমন অপূর্ব শক্তিশালী ভাষা আধুনিক কাব্যে দেখিনি। তাঁর ভাষা মনে করিয়ে দেয় কখনও রবীন্দ্রনাথকে, কখনও বিবেকানন্দকে।

কালস্রোতে প্রবহমান মানবজীবনে বহুতর সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। কালের গতি বৈপ্লবিক। ইতি-নেতি সম্বন্ধের চাপে কালস্রোত এগিয়ে চলে। মানবিক কালপ্রগতির পথ আজ রুদ্ধ করছে নানা জঞ্জাল—হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘর্ষ, বণিকের ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শোষণ। বিমলচন্দ্রের কাব্যে বারেবারেই দেখি সংশয়ান্বিত, নরশোণিত-লাঞ্ছিত আধুনিক সভ্যতার মানসিক ও সামাজিক ব্যাধিগুলিকে তীব্র নিন্দা ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রগতির সর্বপ্রকার বাধা দূর হয়ে মানবজীবনে কালের স্রোত বিবর্তিত হয়ে চলুক ভীমবেগে, স্বচ্ছগতিতে, যতদিন না কালের স্রোত আবার জীবনাতীতে লীন হয়—বিমলচন্দ্র এই মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রগতির অস্ত্র পৌরুষ, মহাকালের আধার জনসাধারণ, কৃত্রিপন্ন বণিক বা অভিজাত নয়। ধর্ম-

ধ্বজীদের ও অহিংসাবাদীদের কটুবাক্যে ভুলে দীনের মত, কাপুরুষের মত শুধু বেঁচে থাকাই কি মানবজীবনের আদর্শ? অহিংসাবাদকে বিমলচন্দ্র দেখেছেন শুধু দুর্বলের নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকার কৌশলরূপে। জীবের অবধ্যতা, জীবনের পবিত্রতা—দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের, এমনকি ঐতিহাসিকের চোখে এর কোন মূল্য আছে কি? অনাদি অনন্ত মহাকালের স্রোত বিবর্তিত হয়ে চলেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ। মহাকালের স্পন্দনই প্রাণ, তার কি বিনাশ আছে? শরীরের বিনাশের জন্য বিলাপ কেন, কৃপাভিক্ষা কেন, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র রচনা কেন? সব্যসাচীর মত গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়ে কালের অভিযান-শীর্ষে নিজের স্থান করে নাও।

প্রগতিপন্থী হলেও বিমলচন্দ্র খাঁটি স্বদেশী কবি। তাঁর মন লালিত হয়েছে, উপনিষদ, মহাভারত ও পুরাণের দ্বারা অথচ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক ও বৈপ্লবিক। এই মণিকাঞ্চনসংযোগ বড় দেখা যায় না। ভারতীয় সংস্কৃতির যাঁরা কোন ধার ধারেন না এমন সব আধুনিক কবিদের লেখায় অনেক সময় কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা, রক্তাল্পতা ও নকলনবিশি ভাব দেখি। মনে হয় যেন সব ফাঁকি, সব জুয়াচুরি (সকলের কথা বলছি না)। "দক্ষিণায়নে" যা পাই, যতটুকু পাই, সেটুকু খাঁটি সোনা।

'মিশ্র রাগিনী' কবিতাটিতে নানা ছন্দে ও নানা সুরে, কখনও দার্শনিকতায় কখনও রসিকতায় পরলোক থেকে লাল পাগড়ি পর্যন্ত সমস্তরই এক দ্রুতাবর্ত চলচ্ছবি দেখানো হয়েছে। মিলে, অনুপ্রাসে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, সূচীমুখ ব্যঙ্গে ও দ্রুত পটপরিবর্তনের কৃতিত্বে কবিতাটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

'অমৃতস্য পুত্রা' ও 'সব্যসাচী' এ দুটি কবিতায় শ্লেষ, বিশ্বমানবের প্রতি দরদ ও পৌরুষ পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে এমন একটা শিল্পজগতের আভাস দেয় যেটি কবির স্বকীয়। নূতন ও পুরাতনের অভিনব সমাবেশ কবিতা দুটিতে দেখি।

'জরা' কবিতাটিতে শক্তির উপাসনাকে যে রূপচিত্র দেওয়া হয়েছে তার রেখা ও রং এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে চোখের উপর সমগ্র ছবিটি ভেসে ওঠে। বিমলচন্দ্রের কল্পনা যে সূক্ষ্মতর জগতেও প্রবেশ করতে পারে তার প্রমাণ এই কয়টি ছত্র থেকে পাওয়া যাবে—

> অরণ্য মর্মর
> যৌবন স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসে
> জীর্ণপত্র ফেলে যায়
> সে পত্রের পীতপাণ্ডু শিরায় শিরায়
> উৎপীড়িত পশুদের রক্তলিপ্ত মূক ইতিহাস
> কিরাতের পদস্পর্শে উঠে মর্মরিয়া।

'মিথুন' কবিতাটিতে ফ্রয়ডিয় আদিম যৌনলিপ্সাকে পৌরাণিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ নন তাঁদের কাছে কবিতাটি অবোধ্য। তবে এক *দীপ্যমান, ভীমাবর্ত সুরলোকের ব্যঞ্জনা সকলেরই চোখে ও কাণে পৌঁছবে।*

'বিবর্তন' ও 'শাশ্বতী' কবিতা দুটিতে মহাকালের প্রবাহ চিত্রিত হয়েছে। কাব্য এই দুটি কবিতাতে গৌণ স্থান অধিকার করেছে বলে আমার মনে হল; দার্শনিক বিচারই প্রবল। তবু বিবর্তন কবিতাটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

মহৎ চিন্তার উন্দামতা কবিতাটিতে আছে আর আছে কঠোর আত্মজ্ঞান ও দুর্ধর্ষ আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সর্বপ্রকার কাপুরুষতাকে জয় করার বাণী।

বৈদিক বিলাপে মন, দিকভ্রষ্ট আমরণ
তপস্যা আলেয়া
কূলহীন কালসিন্ধু এপারে ওপারে নেই খেয়া।

"হাঘরে' রিক্ত অভিজাতের অতীতের প্রেত পূজার চিত্র। চিত্রাঙ্কনে বিমলচন্দ্রের নৈপুণ্য কবিতাটিতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

'যান্ত্রিক'-এ যন্ত্রদ্বেষ ও অহিংসাবাদকে ভীরুতার ও কাপুরুষতার কোঠায় ফেলে যন্ত্রকে কল্পনা করা হয়েছে মানবের দেবত্বের প্রকাশরূপে। 'মানব দানব নয়, মেধাবী যান্ত্রিক'। প্রকৃতির বন্দীশালা থেকে দেবত্বের ক্রমপলাতক প্রাণশক্তি মুক্তির সংগ্রাম করছে যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্র শোষণও করছে, ধ্বংসও করছে কিন্তু তার প্রতিকার মানবের প্রাণশক্তির উৎস রুদ্ধ করে হবে না, তাকে আরো মুক্ত করা চাই। কাব্যের রং ফলিয়ে মানবজীবনের এক বৃহৎ সমস্যা ও মহৎ সত্যকে বিমলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন শুধু মনে নয়, সৌন্দর্যানুভূতির জগতে।

'জনগণেশায়' কবিতাটি symbolical; কবিতাটিতে বিমলচন্দ্রের অভিনব টেকনিক পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি সময়োচিত ও স্মরণীয়। দর্পণে প্রতিবিম্বের মত বর্তমান কাল কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। কবিতাটির চারটি ছত্র আমার মনে গেঁথে আছে যদিও অনেককে তা বেদনা দেবে—

বুদ্ধের গৈরিক বাস
অক্রোধীর ক্রোধযজ্ঞে বহুকাল ভষ্ম হয়ে গেছে
শূন্যে লীন চৈতন্যের অচৈতন্য প্রেমের বিলাপ
গান্ধী আজ শল্য মহারথী।

'স্বয়ম্ভূ'র মধ্যে অসৃষ্ট মানবাত্মার দৃপ্ত জয়যাত্রার ধ্বনিটুকু আমাদের কানে পৌঁছে দেয়। 'ঋগ্বেদ'-এ ছন্দের যে জাদুবিদ্যা দেখানো হয়েছে গুণীজনকে তা আনন্দ দেবে। বিমলচন্দ্রের কবিতা উদ্ধৃত করতে গেলে সমালোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ে। সে প্রলোভন সংবরণ করলাম। কবিতাগুলি সাবানের ফেনার বুদ্বুদ নয়। প্রত্যেকেরই স্বকীয় একটা রূপ আছে। এটি প্রতিভার পরিচায়ক। বিমলচন্দ্রের কবিতায় সূক্ষ্ম কারুকার্যের কিছু অভাব আছে। তাঁর কবিতা একটু বক্তব্যপ্রধান সন্দেহ নেই। কাব্য যদি মানবজীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় তবে তাতে বক্তব্য থাকবে বই কি? যেটাকে বলা হয় art for art's sake সেটা অনেক সময়েই শুধু পেটি বুর্জোয়া নৈরাশ্যের, রুগ্ন আত্মরতির ও পলাতক মনোবৃত্তিরই অভিব্যক্তি। আধুনিক বাংলা কাব্যের সস্তা শৌখীনতা ও মনোজগতের কিনারায় সফরীচাঞ্চল্য সময়ে সময়ে মনকে পীড়িত করে। দুর্লভ শক্তি ও কঠোর তপস্যা ভিন্ন কেউ কবি হতে পারেন না। এই সবাই-কবির দেশে বিমলচন্দ্রের ও অমিয় চক্রবর্তীর মত যথার্থ শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলে মন উল্লসিত হয়। মানবের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকেও যে কবিদৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় এবং উপযুক্ত কাব্য পদ্ধতির দ্বারা তাদেরকেও যে সৌন্দর্যের কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে বিমলচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। এই জন্য প্রগতিপন্থী পাঠক হিসাবে "দক্ষিণায়ন" আমি খুব উপভোগ করেছি।

LILA RAY

I

Earnest and seeking Bimalchandra Ghosh is revolted and revolts against the cruel and stupid world man has fashioned. He is a young poet struggling to free himself of the night-marish effect it has on his mind and imagination. The poems in his first book, Summer Solistice (Dakshinayan), appear to have been hewn out of his thoughts by sheer strength of will and in many we have bold and suggestive work.

> "From the bones of the dead Buddha and the wood of
> Christs Cross
> We have built a fine staircase to heaven."

And again:

> "Captive is Brahma in the cave of golden age dogma.
> "Not this, not that" is this his mantra?....
> He cannot endure the witchcraft of religion
> When he incarnates must he go to gaol?"

Death dances in the black cat's shadow, the hungry moon wakes haggard and pale. bubbles of death rise and burst in life's muddy waters, multi-charactered men living by dreams have no set purpose. Love is "bookish".

He excels in depicting the terrible and the premonitary. A remarkable poem is "The Sun" (Surjya), in which he visualizes the planets conspiring to overthrow the reign of that tyrannical star. Led by Saturn they lie in wait for him at the summer solistice and the august orb betrays a fear of death before his finally setting.

—*The Indian P.E.N* : *March* 1942

II

> With the hand that has made garlands
> My poetry prepares, in flaming metre, thy funeral pyre.

The years have passed in a storm of adversity for Sri Bimalchandra Ghosh though he has grown and matured as a poet since his work was first noticed in this journal several years ago. He is laconic and bitter about the free India which has taken away his job for, he admits, the ebb and flow of his life does not obey the clock. His pockets having been picked he can move about without fear, he says wryly. And

he can imagine the surprise of freedom in the dead eyes of god. He knows the humiliation of ragged clothing and of coming home empty-handed in the evening—to five hungry, young mouths. As the mother crossly scolds a child wailing in the night he recalls how lovely the voice was and how lovely the girl when first she came to conquer him. There is no invalid food in love's sick-room and no poetry in the irritated mind. In his dark restless eyes water wells and he protests that the timid lover's dream of love is not illusory nor is his beloved. He recalls to her endearingly but she is busy with the washerman's list. His love is chastened and humbled, his passion disciplined by poverty. With ardent frankness he faces his faults and fight back through illness to a nobler life. He says :

> In a hell of mistakes,
> I am destroyed by a deadly hooded thing....
> But I arise with a gigantic strength.

A deeper, more universal note is struck. He sees himself and his beloved in all lovers everywhere and the :

> "Bodyless embodied in millions of couples embracing,
> Conquering fate by their copulation."

He is as rebellious and defiant as ever, denying fate, though his work is more tender and often wistful. He has retained his force while his candour is as rare as it is disarming. Technically he has now confident mastery of his medium. Ill and heavily in debt he has made a courageous bid to redeem his situation by placing his poetry within reach of the common people througth the publication of this bi-monthly series of small books. Much of it is leftist in tone and content and the books are displayed wherever leftist literature is sold. He has turned to his poetry, his Savitri, in the desperate hope that it, like the spirited heroine of that name, will be able to save him from death.

Notes on Savitri & Saptakando Ramayan.

—*The Indian P.E.N.* July 1951

III

The *Poush* issue of the *Natun Sahitya* publishes an interesting interview with the well-known poet, Bimal Chandra Ghose. He discussed many controversial aspects of poetry.

Poetry is a thing, he said, which can bring man's disorderly heart and bewildered mind into harmonious order and hold it there; it can inspire him even amidst poverty, grief, want and complaint. A poem without something to say cannot go very deep and it may, when thought is pushed aside, satisfy a thirstly heart for a time with the sweep of its sound, but it will be gone like the dew of dawn. Durability lies in the richness of the poet's thought and feeling. The poet tests his faith and emotion again and again on the touch-stone of his mind and, if he finds it true, he will preach it. His convictions constitute what he has to say.

Form and content, the poet said, are of equal importance. A poet's skill is revealed in the way he fuses the two. If the fusion is complete, the balance exact, the beauty of each is revealed. Every poet knows how difficult it is to achieve this, and, unless it is achieved, a poem is not a poem. The content creates its own form and the form, in its turn, gives substance to the content.

Social awareness should be accepted as a necessary part of the equipment of the poet today. Man creates the arts, and he creates them because they are good for him. It is only natural that the shadow of the problem-riddled world should be found in the work of the poet. The question of detaching literature from life and society does not arise if this simple truth is admitted. It also must not be forgotten that, although the work of a poet is the distillation of his own experience, it voices also the inarticulate feelings of many men.

No poet or writer, Bimal Ghose went on to say, should for any reason forget that the culture and traditions of his country are not his achievement alone. Our forefathers have farmed the alluvial lands of the past for generations and the harvest of their labours lies in the storehouses of the nation. There each new poet finds sustance as he plants a new crop in his turn.

The common people, he said, become acquainted with poetry in two ways : firstly, through textbooks and, secondly, through hearing it recited or sung. Little modern poetry has found its way into textbooks and the ear accepts song more readily than poetry. Many of the poets who have achieved fame in the present century have been singers as well as poets. Shri Ghose suggested that more contemporary poets should

set their verse to music. He said poets should not decry popularity to conceal their own inability.

Genuine poetry, of course, cannot always be easy. Preparation is required to understand and appreciate it. The reader must make an effort to acquire the necessary background. But literaure is not for a handful of educated people. If the poet cannot bring the glory of his poetry down to the level of the simple, he can write for them separately. The solution of problem seems to lie in writing on various levels, simple, brilliant and easy pieces for the unlearned and thoughtful, deeply emotional pieces for the highly cultivated.

—*The Indian P.E.N.*: March 1957

IV

LAST WILL

Bimal Chandra Ghosh

Old man God walks with a stoop
Ranting and cursing.
He wraps His loose frame
In a Kashmir shawl
Rotten with keeping,
The folds are moth-eaten.
The royal beard, so white,
Is stained with strong tobacco smoke.

Old man God stoops beneath a sack
Full of wills upon His back.
To whom shall He bequeath
This encumbered earth?
Care has worn His hair away.

He rants and curses,
And looks about Him.
Vast is the property. To
Whom shall He bequeath it?
Again he alters His old will.

Old man God walks with a stoop
Through the squalor of a slum.
Smudged with mud, all dusty,
A naked boy runs up to Him:
"What's in your sack. old man?"
God snarls and rants, cursing.
The boy, frightened, hides in the shacks.

At Hebo the jeweler's shop
God stops and from His sack
Takes His eternal pipe out.
As He smokes He coughs.
"That naked boy. To him? Far from it!"
Old man God goes on His way.

He coughs. A wasting rasp
Riddles His chest. Down
He sits beside the road
To get His breath. Tremors
Rack His ancient bones.
He rants, in Sanskrit, Chinese, Hebrew.
Who understands? Stupid man stares.
And old man God is furious.

Though the pressure of His blood rises
Makes Him giddy and He falls,
He curses, Old God is helpless now.
His eyes cloud. The slum is foul.
Evening thickens in His filming sight.
The Kashmir shawl trails the dust.
Humble folk, coolies, come to Him.
They lift Him and lay Him with
Care on a tumbledown cot.

A disposer of corpses gives Him Water.
Haru Dom rubs ice on His pate.
Karim the smith and Joseph the tanner
Seek to comfort Him, saying,
"Don't be afraid, old, man." Futile
Comfort. Old man God lies dying
In the dust of a coolie's courtyard.

Dawn breaks beside the tumbledown cot.
People are gathered round Him.
Old man God writes a new will.
To all mud-smudged naked children
He bequeaths the encumbered earth.

—Translated by Lila Ray

অন্নদাশংকর রায়

" ... আট বছর আগে আমি হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিই। কাজের চাপে ছাড়তে হলো এই বোধ হয় যথার্থ কারণ। কিন্তু যে দুটি কারণ আমি গভীর-ভাবে অনুভব করেছি সে দুটি আপনাকে বলি। একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা, আর একটি বাংলা কবিতার ভাষা কেমন হবে তা না বুঝে প্রচলিত ভাষায় লেখার বিড়ম্বনা। অর্থাৎ আমি দেখলুম যাই লিখি না কেন তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি থাকছে, সেটা থাকলে আমার বৈশিষ্ট্য থাকে না। এবং যে ভাষায় লিখি সে ভাষা পচে গেছে। সে ভাষায় লেখা কবিতায় freshness নেই. তা বাংলার মাটির সঙ্গে মেলে না, সে এক প্রকার dead language.

এই দীর্ঘ আট বছর রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি বলে বিশ্বাস হয় নিজের মনে। আব ভাষারও একটা হদিস পেয়েছি। যদিও এখনো তা পরীক্ষাধীন। আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনার বইখানি (দক্ষিণায়ন) যাচাই ক'রে কী দেখলুম? দেখলুম ওতে রবীন্দ্র-প্রভাব পড়ে নি। আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভাষা সেই পোষাকী প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা। আপনি কি ওতেই সন্তুষ্ট? বাংলা কবিতার ভাষা দেশজ স্বাভাবিক না হ'লে ওর কোনো ভবিষ্যত নেই। ভাবের দ্বারা ভাষার অভাব পূরণ করা যাবে না। ছন্দের ওপর আপনার দখল বিস্ময়কর!" ..... "আপনার কবিতার ওর্জস্বিতা, সাহস, high soaring ভাব আমার ভালো লাগে, পক্ষান্তরে আপনার মনের একটা অংশ morbid বা অসুস্থ। কয়েকটি কবিতায় যে করাল কৃষ্ণছায়া পড়েছে তা objective বিশ্বের নয়. subjective মনের। দেশের এই ঘনায়মান দুর্যোগে কাব্য রচনার লগ্ন আসছে, কিন্তু যাঁরা লিখবেন তাঁদের লেখনীতে থাকবে মানুষের লালায়িত সহজ সুস্বাদ ভাষা, ক্রিয়াপদগুলি হবে চলতি, সমাসগুলি হবে ভাসা ভাসা কতকটা বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউলের গানের মতো। আর তাঁদের মনের কোথাও অন্ধকার থাকবে না, দুর্যোগ যা কিছু তার মনের বাইরে, বহির্বিশ্বে। অন্তর্দীপ্ত দ্বারা তাঁরা এই তিমির ভেদ করবেন।"

—পত্রাংশ : ১৭।৪।৪২

* * *

... .."আপনার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার মন কেমন করে। কিন্তু আপনি born fighter তথা born writer যেমন ক'রে হোক টিকে থাকবেন ও লিখে যাবেনই।"......"আপনার "উলুখড়" ছাপানোর জন্য মনি-

* শান্তিনিকেতন থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলা রায় "অর্ধশতাব্দী"র জন্য বিমলচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতা "শেষ উইল"-এর এই ইংরাজী অনুবাদটি পাঠিয়েছেন। কবিতাটি "উদাত্ত ভারত"-এর ১৫৪ পাতায় আছে।

অর্ডারে টাকা পাঠাচ্ছি। আশা করি ভালোই বিক্রি হবে।"......"সংস্কৃত রইল পুঁথির পাতায়, প্রাকৃত রূপান্তরিত হ'ল বাংলা ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষায়। যে সব ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল। গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হ'ল ছন্দ, মিল, rhythm, rhyme। ক্রমে একটা সময় এল যখন বাংলা কবিতায় ছন্দ ও মিল কালিদাস, জয়দেবের মতো নিখুঁৎ হ'ল। আপনি সেই নিখুঁৎকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন। তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাকে আধুনিকতার পরিপন্থী ভেবে পরিহার করছেন না। এখানে আপনার প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাচ্ছি ও প্রশংসা কচ্ছি।"......"স্বল্প অবসরে যে যত বড় চালাক, সে তত বড় আধুনিক। এই clevernessই আধুনিক কবিদের সম্বল। এটাকে আমি দুর্বলতা মনে করি। আপনি এর থেকে মুক্ত।"—পত্রাংশ : জানুয়ারী ১৯৪৩। "...আপনি born poet, আপনি বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুতাপে শত শত কবিতা লিখে যাচ্ছেন ও যাবেন, হয়তো শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো হতাশ হ'য়ে ভাববেন, এর কিছু কি টিকবে! টিকবে কিছু টিকবে।"......

"আপনি কবি, আপনার লক্ষ্য হৃদয় জয় করা। লক্ষ মানুষের, কোটি মানুষের প্রেমিক হওয়া। যদি দরদী হন, যদি সকলের দুঃখ অনুভব করেন, যদি সকলের সুখে সুখী হন, যদি সকলের মনের কথা সকলের মনের মতো ক'রে ব্যক্ত করতে পারেন তাহ'লে আপনার কবিতা সার্থক, আপনার কবিতা অবিনাশী হবে। আপনার কয়েকটি নতুন কবিতা পড়েছি, ভাষা ক্রমশ সহজ, ছন্দ ক্রমশ সচল হয়ে আসছে কিন্তু রস আরো জমাট হওয়া চাই।"

—পত্রাংশ : ২০।১০।৪৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"..'দক্ষিণায়ন' পড়ে খুব খুশি হয়েছি। আপনার ছন্দোনৈপুণ্য অসাধারণ, শব্দচয়ন সার্থক, ভাব ও ভাষার ঐক্য দুশ্ছেদ্য।"

—৭ই জুলাই ১৯৪১

অমিয় চক্রবর্তী

'দক্ষিণায়ন' পড়ে কাব্যের আনন্দ পেয়েছি এবং নতুন কাব্যধারার গতিবিধি সম্বন্ধে ভেবেছি। অনুভূতির গাঢ়তা আপনার রচনাগুলিতে ঘন ছন্দোবেগে প্রবাহিত হয়েছে। ধ্বনির বাগ্মিতা আপনার কাব্যের স্বভাবসংগত। অথচ আপনার মন নতুন কালের ছোঁয়া-লাগা। সুতরাং ভাষার প্রতিষ্ঠিত ভঙ্গীর মধ্যেও আপনি চলতি কালের বর্ণালোক সঞ্চার করেছেন।...দক্ষিণায়নের কবিতা কল্পনার নানা মহলে ডাক দিয়ে যায়।

—চতুরঙ্গ : আশ্বিন ১৩৪৮

* * *

"এবারের পুজোর পত্রিকাগুলিতে আপনার বিচিত্র রকমারি কবিতা পড়লাম। খুবই ভালো লাগলো। কোনো একটিকে পৃথক ক'রে প্রশংসা করলে পক্ষপাত দোষ ঘটবে কিন্তু আসামী জঙ্গলের শঙ্কিত চিত্রাঙ্কনে আপনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বুনো পাহাড়, বর্বর কালের পাখী, চুংকিং-এর অন্যমনা উড়ন্ত বলাকা আপনার ছন্দের বিন্যাসে এবং তেজালো ভাষায় মনকে দ্রুত আঘাত ক'রে গেল।...'উলুখড়ে'র খবর কি? এক পয়সায় এক বাণ্ডিল ক'রে গলির মোড়ে বিক্রি হবে আশা করে আছি।"

—পত্রাংশ : ৭ই অক্টোবর ১৯৪২

"চুংকিং-এ আপনার কবিতা ঠিকমতো পৌঁছেছে খবর পেলাম। শীঘ্রই চৈনিক নবজন্ম পরিগ্রহ ক'রে আপনার কবিতা নতুন পাঠকজগতের মনোরঞ্জন করবে। ভেবে খুব ভালো লাগছে। যথাসময়ে অর্থাৎ অত্যন্ত দেরিতে—চীন হরফে আপনার কাব্যের মুখদর্শন করবেন কিন্তু চিনতে পারবেন না মনে হচ্চে।" (†)

—পত্রাংশ : ৩রা জুন ১৯৪৩

* * *

"আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সুর যুগধর্মী হয়ে ফিরে আসছে, মহাকাব্যের মর্মতা গীতিকাব্যে ধরা দিচ্ছে, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। বিষ্ণু দের 'জন্মাষ্টমী' ও বিমলচন্দ্র ঘোষের 'ইন্দ্রপ্রস্থ' বাংলা কাব্যে পূর্ব-নূতনকে মিলিয়ে আবির্ভূত।"

—'কাব্যভারতী' : মেঘনা : বৈশাখ ১৩৫৪

বুদ্ধদেব বসু

"আপনার 'বনপর্ব' চমৎকার হয়েছে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কবিতাটির নাম বদলে আমি দিতে চাই 'আসাম'।"

—পত্রাংশ : ২৮শে সেপ্টেম্বর '৪২

মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)

"এই বাদ-বিসম্বাদের দিনে বিমলবাবুর অবিসম্বাদিত কবি-প্রতিভা স্বধর্মে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করি।"

—জুলাই ১৯৪১

অজিতকুমার দত্ত

"বিমলচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষিণায়ন' একখানি উল্লেখযোগ্য বই। বিমলবাবুর ভাষা সহজ ও বলিষ্ঠ, বক্তব্য স্পষ্ট এবং ভঙ্গী মৌলিক। তা ছাড়া ছন্দের ওপর তাঁর দখল অসাধারণ। 'দক্ষিণায়ন' একবার পড়েই ভালো লাগে, আবার অনেকবার পড়লেও ভালো লাগে।"

—৭ই জুলাই ১৯৪১

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"...তোমার শক্তি নানাপথে আপনাকে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 'দক্ষিণায়ন'-এ পথের অতৃপ্তি ও অন্বেষণ আমার চিত্তেও সঞ্চারিত হয়েছে। কয়েকটি কবিতা বিস্ময়কর, আবার দু-একটি কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারলাম না। শ্রদ্ধা ও আশার সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে যাব—কোন্ পথে তোমার শক্তি জয়যুক্ত হয়।"

—পত্রাংশ : ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩

(†) অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট কবিতা "আসাম" বিমলচন্দ্রের ১৯৪২ সালের রচনা। "আসাম"-এর ইংরাজী অনুবাদ অমিয় চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা হাতিসিং সম্পাদিত সাহিত্য-সংকলন India Speaks-এ প্রকাশিত হয়। পরের বছরে চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে চুংকিং থেকে প্রকাশিত একখানি অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট কবিতা সংকলনে স্থান পায়।

"তোমার কবিতায় এমন একটি শক্তির আভাস আমি দেখেছি যার সম্পর্কে কোন রকম মুরুব্বিয়ানা করা পরে আমার পক্ষেই লজ্জার কারণ হতে পারে।"

—পত্রাংশ : ২৮শে মে ১৯৪৩

* * *

"'উলুখড়'-এ তোমার শক্তির নূতন পরিচয় পেয়েচি ও মুগ্ধ হইচি। ছোট ছোট কাব্য-কণিকাগুলি মণিমুক্তার মতো ভাব-ব্যঞ্জনায় ও ছন্দ-লাবণ্যে ঝলমল করচে।"

—পত্রাংশ : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪৩

* * *

"তোমার 'মণিপদ্ম' পড়লাম। কবিতাটি একান্ত ইঙ্গিতময় ব'লে মনকে খুব টানে, অথচ দু-এক জায়গায় অর্থের সামঞ্জস্য করতে পারলাম না। তোমার ভাব গভীর হওয়ায় ভাষা ইঙ্গিতময় ও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হতে বাধ্য। তোমার এই ধরনের কবিতা আমার ভালো লাগে, গভীরতা ও স্বকীয়তার জন্য। আরো কিছুদিন পরে হয় আমি নিজেকে তোমার সঙ্গে adjust ক'রে নিতে পারব। নয় তুমিই আরও স্পষ্টবাদী হবে। মোটের উপর তোমার 'মণিপদ্ম' আমার মনকে খুব আকৃষ্ট করেচে।"

—পত্রাংশ : ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৪

* * *

"তোমার "ফতোয়া ১৮৪৮—১৯৪৮"(†) পেইছি ও পড়েছি। তোমার মত ও পথ এতদিনে ঋজুতা লাভ করেছে দেখে আনন্দ হ'ল। বলিষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে বলিষ্ঠ প্রকাশের সম্মিলন ঘটেছে।"

—পত্রাংশ : ২৯।১।১৯৪৯

* * *

"পূর্বাচলে তোমার কবিতাটি পড়ে বিস্মিত ও অভিভূত হইচি। সব দিক থেকে অমন সুন্দর একটি কবিতা লিখতে পারা যে কোনো কবির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। ঐ কবিতাটি সম্পর্কে তোমায় অভিনন্দিত করবার জন্যই চিঠি দিচ্ছি।"*

—পত্রাংশ : ১৯-২-১৯৫০

* * *

"তোমার কবিতা 'টাইফয়েড' পড়িছি ও আনন্দ পেইছি। কিন্তু এটি বহু পূর্বের লেখা জেনে কিছু ক্ষুণ্ণ হলাম। তোমার কবিতা যেখানে কবিতা হ'য়ে ওঠে বা উঠে না-নেমে-আসে সেখানে তোমার সাহিত্যিক মতবাদ ও আদর্শ আমার সঙ্গে অভিন্ন। যা প্রভেদ সেটা সাংবাদিক সাহিত্যের স্তরে। পূর্বাচলের দুটি কবিতাই অপূর্ব হয়েছে। মতবাদ পথবাদে নামে নি।

(†) Communist Manifesto Centenary (1848-1948) উপলক্ষ্যে এ দেশে একমাত্র প্রগতিশীল কবি বিমলচন্দ্র ঘোষই সর্বপ্রথম এই কাব্যপুস্তিকাটি প্রকাশ ক'রে উজ্জ্বল মার্কসবাদী চেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় দেন। কবিতাগুলি দৈনিক 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

* "অগ্নিসিন্ধা"—'উদাত্ত ভারত' দ্রষ্টব্য।

অন্তর স্পর্শ ক'রে সেইখানেই লগ্ন হয়ে আছে। প্রথম কবিতাটির শেষ ছত্র অপূর্ব—"ছুটে চলি তাই কোটি মানুষের ভাবনাসিন্ধুকূলে!" এই-খানে না থেমে যদি পথ বাতলাবার প্রয়াস থাকতো তা হ'লেই কবিতার জাতিচ্যুতি ঘটতো। এই দুটি কবিতায় আমি আমার অন্তরের ব্যথার মূর্তি দেখতে পেয়েছি।"...

—পত্রাংশ : ১৬-২-১৯৫০

* * *

'সাবিত্রী' পড়লাম। বিমলচন্দ্রের বিপ্লবী মনের যে রসমূর্তি এতে ফুটে উঠেছে তা অপূর্ব। যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি কালের দংশনে বিশ্বমানবরূপী সত্যবান আজ গতপ্রাণ, আর তাকেই পুনরুজ্জীবিত কর-বার সংকল্প নিয়ে বিপ্লবী কবির কাব্য-সাবিত্রী তার 'প্রাণযাত্রা' সুরু করেছে। 'সাবিত্রী'র কবি প্রেমের আলোকেই তাঁর বিপ্লবী চিত্তকে বিকশিত করতে চেয়েছেন। বিমলচন্দ্রের কবিতায় ঘরোয়া প্রেমের উপর ব্যঞ্জনাময় শ্লেষের কশাঘাত যেমন তীব্র, বিপ্লবের পথে মহত্তর প্রেমের প্রতি আকুল উৎকণ্ঠা তেমনি আন্তরিক হয়ে ফুটে উঠেছে। 'সাবিত্রী' অকুণ্ঠিত প্রশংসার যোগ্য।"

—পত্রাংশ : ৪-১-১৯৫১

সুকান্ত ভট্টাচার্য

" আমি আপনার কবিতাব একজন অন্ধ ভক্ত..."

—পত্রাংশ : ২০।২।১৯৪৫

* * *

"বিমলদা, সম্প্রতি X-Ray-তে ধরা পড়েছে আমার রোগটা টি. বি। পার্টি থেকেই চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, মুজফ্‌ফর আহমদ। তিনি বড় বড় ডাক্তার দেখানোর বন্দোবস্ত করেছেন। একজন M. D. ডাক্তার দেখে prescription দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে।......আপনি আমাকে আপনার 'দাক্ষিণায়ন' দেবেন বলেছিলেন মনে আছে? যদি এখন পাঠিয়ে দেন তা হ'লে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে উপভোগ ক'রে পড়তে পারি।"

—১১বি, রামধন মিত্র লেন : পত্রাংশ : ২৬-২-১৯৪৬

DHURJATIPRASAD MUKHERJI

It was about seven years ago that a certain poem in the KABITA attracted our attention. The author, Bimalchandra Ghosh, was a total stranger in the world of letter. But the poem had a maturity which was all too rare in the formless poeticalities of the day. True that Sudhindranath Datta had taught us the virtue of having a vertebrum in prose and poetry, but presumption of his demand was a level of intellectual and technical discipline which few could reach with the usual equipments. Some did, and among them Bishnu De was the foremost. At that particular period however, he was deve-

loping tangentially in response to the general pull of social awareness, which by its nature partly weakened his original intensity but permitted him to compensate the loss by technical cleverness. The problem before the discriminating reader was a difficult one indeed. It was to square the emerging social content with the new sense of style. Bimalchandra Ghosh's poem was certainly no solution; but it showed that the coming generation had seized the issue. Since then our unknown author has bloomed into a well-known poet. His 'Dakshinayan' was a solid piece of work marked by serious thought and appropriate diction. 'Dviprahar and other Poems', the latest volume continues the tradition of his verse; it is also a step ahead.

This progress is fairly indicated in the grouping of the poems. The Dviprahar is the mid-day of India's glory and of the author's vision. Two fairly long poems, 'Jambudvip' and 'Indraprastha', so to say, mark the meridian. Then the equatorial darkness suddenly descends with all the gloom of 'Kalaratri', the night of the soul. But 'Mahalaya' comes heralding in the new world. And we listen to the throb of life in the 'Prana-pinda', feel the onrush of the West through the 'Suez' canal, and witness one of its achievements in the 'Suez' canal, and witness one of its achievements in the 'Howrah Bridge', that symbol of mechanical, non-human efficiency. A faint music of equality, 'Samaya', emerges out of the clang of steel. But the penalty is to be paid in the interim, and the 'Madhyamik' is full of poems that burn with indignation at man's fate. The war intervenes; and the troubled soul of our poet harks back to the abiding values of man in India so firmly fixed in her myths and legends. Finally, the poet finds his haven in love. It is needless to say that his love is not quite the same thing as the love of the romantics. After a voyage round the globe it could not passibly be. Bimalchandra's group of poems called "Prem" do not remind us of the romantic agony of an earlier age when love and its frustration were the be-all and end-all of poetry. And yet love it conveys, love enriched by a high endeavour to adjust individual appetite with larger responsibilities towards humanity. Humanism and faith in life are our poet's ruling passions.

Technically, Bimalchandra has achieved competence. His diction is commensurate with the occasion, which invariably is a solemn one. Thus it is that his poems are replete with

Sanskritic-words and images. They usually make for compactness and dignity, that is, rhetoric in the best sense of the term. But there are pieces in the volume which seem to spoil the effect of terseness by their physical length and Psychological fluidity. Probably, one who has felt the sorrow of the world through the sorrow of Bengal, and that as deeply as our poet has done. cannot easily keep one's artistic integrity intact. Nevertheless, the wonder is how much of it has been preserved. With the advent of better times, Bimalchandra will surely maintain the happy balance between form and content. Meanwhile, his poems will continue to delight those who care for style and have a feeling for social values. Bimalchandra is a genuine poet and he can be ignored only at the cost of a great deal of pleasure and a serious attitude towards poetry and life. —1*st July* 1946.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

তান বর্জন ক'রে বাংলাভাষায় কবিতা লিখলে গাম্ভীর্য বজায় রাখা যায় না; চিত্তের আবেগ ব্যাহত হয়, লীলাময়ী, বিক্রীড়িতা কল্পনার ভার দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। বিমলচন্দ্রের কবিতা সচরাচর হালকা নয়, যদিও হালকা কবিতা তিনি আগে লেখেন নি এমন নয়। তাঁর কাব্যের ওজন আছে। গণশক্তির পৌরুষ, সাংস্কৃতিক কল্পনার সাহচর্যে ঘনমন্দ্রিত তানে রূঢ় ও বলিষ্ঠ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কাব্যে। "উলুখড়"-এ বিমলচন্দ্র হঠাৎ বিবাগী হ'য়ে বৈরাগ্যের ছড়া কাটতে লেগে গেছেন। ছড়াগুলি স্বল্পভাষিত হ'লেও সুভাষিত। ছান্দসিক বৈচিত্র্যের ও সিদ্ধির দিক থেকে এই ছোট ছোট কবিতাগুলি—অসামান্য শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। এলোমেলো ছেঁড়া রুপালী মেঘের মতো এই কবিতাগুলি পাঠকের মনে অল্প একটু ছোঁয়া দিয়েই পালিয়ে যায়। মেঠো গানের টুকরোর মতো কান ডিঙিয়ে হয়তো মনে পেঁছতেই পারে না। নানা ছাঁদের ও রঙের কাগজের নৌকো বৈরাগী হাওয়ায় মন্থর হ্রদে ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হয়। মোটের ওপর ছোট হালকা কবিতার যে সব গুণ থাকা দরকার—দমকা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, লঘু ও সরস প্রযুক্ততা, অনুক্ষ বক্রোক্তি, উড়ো উদাসীন ভাব—প্রথম দিকের দুটি পরিচ্ছেদের কবিতায় সেগুলির অভাব হয় নি।

—"পরিচয়" : আশ্বিন ১৩৫০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট, ঐতিহ্যস্নাত দার্শনিক মন আর পাকা কলম নিয়ে আধুনিক কবিদের আসরে বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন দখল ক'রে নিয়েছেন। আলোচ্য বইখানি অবশ্য আয়তনে ছোট এবং কবিতাগুলির আকৃতিও তাই। এর সুর মৌলিক কিন্তু আলাদা, যদিও প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর আসল বক্তব্য ধরা পড়েছে।......ছোট ছোট কবিতাগুলিতে ছন্দের আশ্চর্য কৌশল আছে। পড়তে ব'সে অপ্রত্যাশিত মিলে আর অনাড়ম্বর জৌলুসে মন খুশি হ'য়ে ওঠে।......এখানে তিনি নতুন বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা

করেছেন।...দার্শনিকতা ও সংস্কৃতির ভারগ্রস্তমন এবারে দেশের প্রকৃত জীবন, কর্ম ও সহজমুক্তির সন্ধান পেয়েছে মনে হ'ল।"

—'উলুখড়'-এর সমালোচনা : "কবিতা" : চৈত্র ১৩৪৯

* * *

অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালের বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা করেন একটি বিস্তৃত ইংরাজী প্রবন্ধে। তিনি বাঙালী আধুনিক কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন :

"....The only other pure poet is Bimalchandra Ghosh whose effort to evelve a poetic faith and transcend all literary fashions is untiring. He chooses to work on a broader canvas, loves colour and carries his emotional responses over waves of impassioned eloquence. Yet he can briddle himself and produce verses of a bewildering variety. He has an amazing diction, as his new book "Dviprahar" strikingly demonstrates a rich repertoire of classical images and metrical experiments."— Survey of Literary Activities. 1945 Bengali Literature.

—*All India Weekly Literary Annual* 1946.

* * *

SAROJ ACHARYA

"..Another poet of distinction Bimalchandra Ghosh has in recent years inclined towards the Left and has made some interesting experiments in pouring the feelings of social ferment into a firm classical mould."

—Cross-Currents of Bengali Literature Today: *The Republic,* July 30, 1949.

যতীন্দ্রমোহন রায়

" .সোজা সত্যকথা দরদ দিয়ে গুছিয়ে প্রাণখুলে এমন সুন্দর করে তোমার মুখে শুনে যে আনন্দ পাই তা অনেক দিন পাই নাই। আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র যেন ওর কতকগুলির মধ্যে আছে। তবে মনে হয় তাদের সইবার শক্তি বুঝে ধাক্কা দিতে হবে। শত শতাব্দীর আঁধারে অভ্যস্ত দেশের লোকের চোখ সত্যের এই সুদুঃসহ রুদ্র রূপে যাতে আঁৎকে না ওঠে এমনি ধাত-সওয়া করে ধরতে হবে সত্যের রূপকে তাদের সামনে। যাদের এগুলি কাড়াকাড়ি ক'রে পড়ার সম্ভাবনা তাদের সমবয়সীদের কয়েকটিকে সেদিন দেখিয়ে এনেছি ওদের* উৎসকে। ঐ শিশুরা আর দেশের নিরুপায় অসহায়

*১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কবি বিমলচন্দ্র যখন জলপাইগুড়ির বড়দা নৃপেন্দ্র বাগচীর বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় অগ্নিযুগের সর্বজনমান্য নেতা বগুড়ার যতীনদা কয়েকটি কর্মীকে নিয়ে বিমলচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিমলচন্দ্র যতীন্দ্রমোহনকে "দ্বিপ্রহর" থেকে তাঁর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান।

প্রবঞ্চিত বয়স্ক সাধারণ লোকের দলও যাতে বোঝে এমন করে তোমাদের কিছু লেখা বেরোক্ এই আমার ভিক্ষা। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি দেশের লোক আমাদের কথা বোঝে না!...তোমরা আমাকে যা ভেবে আপন ভাব তার কাছে পোঁছাতে পারলেও ধন্য হতাম। নিজের ব্যথার কান্না আর কাঁদবো না।" (পত্রাংশ)

—জলপাইগুড়ি, রথীন রায়ের বাড়ী : ২৫শে জুন ১৯৪৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার একখানা চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। অত সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্যে আমাকে এমনভাবে মনে রাখবেন এ আশা করি নি। অকৈশোর আপনি আমার প্রিয় কবি। আপনার কবিতায় যে আত্মপ্রত্যয়শীল বলিষ্ঠতা আছে আমার মনকে তা বারে বারে নানা বিচিত্রভাবে দোলা দিয়েছে —আপনার কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। কতদিন —কতবার গুন্ গুন্ করে আপনার কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করি। সেই আপনার সঙ্গে কী সহজভাবে কী চমৎকার আলাপ হয়ে গেল ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে। ......দেহে মনে ওজন-মাফিক সাহিত্যিক হওয়ার চাইতে সহজ স্বাভাবিক মানুষ হতেই আমার ভালো লাগে। আর এদিক থেকে আপনার মধ্যেও আমার খানিকটা স্বাজাত্য দেখেছি—তাই স্বল্পতম পরিচয়েও বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিকে অনেকখানি অন্তরঙ্গ বলে ভাবতে কোথাও বাধছে না......।"

—পত্রাংশ : ২৪শে আগস্ট ১৯৪৫

"এই নতুন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর রচনার প্রতি পংক্তিতে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস, অজেয় মানুষের জয়যাত্রার বন্দনা। অসাধারণ বলিষ্ঠ লেখনীতে বিমলচন্দ্র ঘোষ বাংলা কবিতায় একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। তাঁর ভারত-প্রশস্তি "জম্বুদ্বীপ" কবিতায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশের অপূর্ব মূর্তি রূপায়িত হয়ে উঠেছে :

"স্বর্ণাভ উদয়তীর্থে গৈরিক হিমানীবাষ্প ওড়ে
অদৃশ্য সূর্যের অভ্যুদয় কত দূরে?
আদিগন্ত তরঙ্গিত গিরিশৃঙ্গমালা
স্তিমিত গম্ভীর মৌন......

হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
ত্রিমুণ্ড তুষারশৃঙ্গে জ্বলে রক্তদীপ!"

'শেষ উইল' কবিতায় আগামী গণ-যুগের বিপ্লবী সংকেত :

"বস্তির যতো ধুলো কাদা মাখা ন্যাংটা ছেলের নামে
বুড়ো ভগবান লিখে দিয়ে যান নতুন উইলে তাঁর
দুনিয়ার এই গোলমেলে সম্পত্তি।"

যন্ত্রযুগের বলিষ্ঠ প্রণাম তাঁর হাওড়ার ব্রীজ :

"যান্ত্রিক মহিমায় উন্নত শির
বিংশ শতাব্দীর তুমি মনসিজ
হাওড়ার ব্রীজ!"

কবি মায়াকোভস্কিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।........."

—বঙ্গলক্ষ্মী : আশ্বিন ১৩৫৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"তোমার 'দ্বিপ্রহর' আমার সঙ্গে এখানে এসেছে। তোমার বৌদির ঐ বই-খানি বড় প্রিয়। রোজ একবার পড়বেনই। আমিও মাঝে মাঝে পড়ছি। আমার মনে হয় তোমার কবিতাগুলির মধ্যে যে বলিষ্ঠ সুর লক্ষ্য করেছি, এমন সুর আধুনিক কোনো কবিতায় দেখি নি। ভালো করে লিখবো এর পরে। এ বইয়ের সম্বন্ধে যদি তাড়াতাড়ি কিছু বলতে যাই, তোমার প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে। তোমার বৌদি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমার কথাটা ভালো করে লিখে দাও।...আমার গল্প এখন পাবে না। মিথ্যে স্তোকবাক্য প্রয়োগ ক'রে ফাঁকি দেব না তোমায়, কেননা তোমায় শ্রদ্ধা করি, শ্রদ্ধা শুনে ঘাবড়ে যেও না...।"

—পত্রাংশ : ঘাটশিলা : ২৫-৯-১৯৪৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"...জানি গল্পের জন্যে মনে মনে আমার মুণ্ডপাত ক'রছেন, তা'র জন্যে মাপ চেয়ে রাখছি। আসছে সপ্তাহে পাবেন। ক'দিন এক দমে ঘুরতে হ'লো ক'লকাতার আশপাশের কলকারখানা এলাকায়। মানুষ যে আপনার কবিতা কত ভালোবাসে তার প্রমাণ পেয়েছি। বেশির ভাগ এলাকায় আপনার কবিতার আবৃত্তি শুনেছি। গরীব মানুষরাই আপনার ভক্ত। উন্নাসিকরা আপনাকে পছন্দ করে না। ওদের মন-ভোলাবার কথা আপনার কবিতায় নেই। থেকেও কাজ নেই, আপনার যেন সে মতিভ্রম না-হয়। আপনাকে সতর্ক করতে-যাওয়া আমারই ভুল, কারণ "ক্ষুধার" কবি ক্ষুধিতদের বুকের আগুনে কবিতা লেখেন।..."

—একখানি পোস্টকার্ড : ২৭শে জুলাই ১৯৫০

অমিতাভ : (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

"বিত্তহীন সাহিত্যিকের (সুরেশ চক্রবর্তীর) কাগজ 'উত্তরা'-পূজাসংখ্যা শুধু একটিমাত্র কবিতার জন্য পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে। স্বনামধন্য কবি বিমলচন্দ্রের একটি কবিতা এই সংখ্যায় পড়িয়া মনে হইল এই কবিকে সম্মুখে পাইলে আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আলিঙ্গন করি। কবিতাটির নাম "অগ্নিসিন্ধা"। কবির অগ্নিদগ্ধ বুকের দাহে কবিতাটি যেন জ্বলিতেছে। আমরা এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম :* বিমলবাবু তরুণ লেখকদের মধ্যে বয়স্ক,

* কবিতাটি স্থানাভাবে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা গেল না। "উদাত্ত ভারত"-এর ১৮৫ পৃষ্ঠায় আছে।

—আধুনিক বামপন্থী লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইয়াও তিনি সত্যকার কাব্যের পথ, আনন্দ ও সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই—ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। এই কবির গর্জন আছে বজ্রের, ভাবের গভীরতা আছে সমুদ্রের, প্রকাশ-ভঙ্গির অপূর্ব কুশলতা আছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর, বিষয়বিন্যাস ও ভাবব্যঞ্জনার কৃতিত্ব আছে শ্রেষ্ঠ কবির। হৃদয়ের সীমাহীন ঔদার্য ও অন্তরের ভাবগম্ভীর তন্ময়তা কবিকে আজ বাংলাদেশের কবিসমাজে অক্ষুণ্ণ সম্মানের আসনে বসাইয়াছে।...দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় দুঃখের কথা, অক্ষমতার কথা এই যে,—এমন কবিও আজ সপরিবারে প্রায় অনাহারেই জীবন যাপন করিতেছেন। উপার্জন নাই, সহায়-সম্পদ নাই,—সংসার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবার কোনও উপায় নাই! তবুও আজ এই কবি—বাংলাদেশের প্রধানতম সহরে—দৈনন্দিন নিরানন্দের মধ্যে, সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যে, তাঁহার সাধনার দীপটি যে প্রাণের আলোকে আজিও আমাদের সম্মুখে জ্বালিয়া রাখিয়াছেন ইহা আমাদের পক্ষে যেমন গৌরবের কথা, তেমনি লজ্জার কথাও বটে।...বিমল-বাবু ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া নিষ্প্রদীপ চুন-বালি-খসা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে সপরিবারে অনাহারে শুকাইয়া মরুন—আমরা সদম্ভে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মহামানবতার ভাঙা জয়ঢাক বাজাইয়া আসর সরগরম করিব।...যিনি আমাদের সাহিত্যে অনেক কিছু দিয়াছেন, যিনি সাহিত্যকে সম্পদসম্ভারে আরও সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন, —দেশকে সম্মানিত ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেন তিনি আজ সপরি-বারে খাওয়া-পরা, সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর অধিক কি হইতে পারে?"

—পূর্বাচল, সাহিত্য-প্রসঙ্গ : কার্তিক ১৩৫৮

PRATAP BONNERJEE

বিমলচন্দ্রের একটি লিরিক কবিতা পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বনার্জী কবিতাটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

THE DREAM ETERNAL

That silvery dream reflected in the dew
In love afresh with each morn's rising sun
Turns ever, as a sunflower, to its love
And greets with eager eyes each new born day.

The butterfly with gorgeous wings flies past,
A flowery perfume scattering on its way
Love—tender, gentle. iridescent love,
Quivers between a maiden's heart and mind

And morning melody in its rhythm bears
The deeper notes of Life's grand harmony:
In love with each new dawn the dream itself
Takes on its loved ones immortality.

(*Translated from the original Bengali of Bimalchandra Ghosh*)
—THE SUNDAY STATESMAN : December 11, 1949.

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

"......বাংলাদেশে আজ সব থেকে জনপ্রিয় আধুনিক কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। বেশী দূর যেতে হবে না। ক'লকাতার আশেপাশে যে কোন জায়গায় গেলে প্রচুর লোক পাবেন যারা বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা মুখস্থ ব'লে যেতে পারে। এক সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোন আধুনিক কবির এ সৌভাগ্য হয় নি। ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজজীবনে নানা রকমের সংঘাত সত্ত্বেও বিমল ঘোষের কলম কখনও থামে নি। কাব্যের প্রতি এমন অচঞ্চল নিষ্ঠা আমাদের দেশে বিরল। আধুনিক কবিদের মধ্যে আর কেউ এত বেশী কবিতা লেখেন নি, এত বেশী লেখার ক্ষমতাও বোধ হয় কারো নেই।...বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতার অজস্র প্রশংসা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে সত্যিকারের সমালোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ।......সমালোচকদের উপেক্ষা সত্ত্বেও বিমল ঘোষের কবিতা ও তাঁর পাঠক সংখ্যা কয়েক হাজার......কেউ চিনিয়ে না দিলেও পাঠকরা খুঁজে-পেতে তাঁকে চিনে নিয়েছেন। তাছাড়া আধুনিক কাব্যে দানের দিক থেকে যিনি সব থেকে অকৃপণ তাঁর প্রতি সমালোচকেরা যদি কার্পণ্য দেখান তাহলে নিদারুণ অন্যায় হবে।......'সাবিত্রী' মোটামুটি প্রেমের কবিতাগুচ্ছ।

"সম্ভ্রমে প্রেমে পৌরুষে জাগো বিপ্লবী চেতনায়
কাব্যলোকের হে সত্যবান সাবিত্রী-প্রেরণায়।"

[—সাবিত্রী : পৃঃ ৩]

তারপর :

"সহস্র কাজের ফাঁকে স্মরণের নিভৃত মুকুরে
বার বার কাঁপে সেই মুখ,
দেবদৈত্যবিজয়িনী সেই তন্বীতনুর ঋজুতা,
দুটি চোখে বিদ্যুতের উজ্জ্বল ভ্রমর
মনে পড়ে কুন্তলনাগিনী।"

[—তিলোত্তমা : সাবিত্রী : পৃঃ ৯]

আধুনিক কবিতায় প্রেমের মূল্য দেবার জন্যে আজকাল বেশ একটা আন্দোলন চলেছে; কাজেই সেদিক থেকে এই কবিতাগুলির মূল্য সম্পর্কে বেশী বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, প্রেমের কবিতার নায়িকা খোঁজার জন্যে কবি বিমল ঘোষকে বিদেশী সাহিত্যের দরবারে হাত পাততে হয় নি, দেশের মাটিতে এবং দেশের লোকের স্মৃতির মধ্যে তাঁর প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন।......"

—পরিচয় : মাঘ ১৩৫৭

J. BHAR

New Aestheticism

Poet Bimal Ghose's is already a very well-known name among Bengal's modern aesthetes to whom poetry is not merely a branch of aesthetics but an instrument of social consciousness. His present* anthology of fifteen poems has to be evaluated in the sickening context of our poetic practices of a decade ago which betrayed a certain amount of old-fashioned romanticism as well as individualism, though technically speaking, none would deny their novelty not unoften bearing the mark of felicity as well. Mr. Ghose's poems stand on a different pedestal. He has bolted courageously away from the age-old tradition of looking at life through an individual's eyes and taken to the vogue of fearing poetry to the high purpose of helping humanity move ahead towards its destined goal of a better and lovelier social order. This is not to suggest that Mr. Ghose is a propagandist nor that his poetry is just pamphleteering. Far from it, his poetry synthesises the two apparent contradictions—art and social consciousness—into one magnificent whole. On the one hand his poems, because of their rounded felicity of expression and their creator's masterful command over the art of versification, may well go down as things of beauty; and on the other, because of Mr. Ghose's sense of responsibility as a member of the human society—his sense of oneness with humanity, one may say,—his poems are purposeful and informed with that element of high seriousness which constitutes the very backbone of all great literary creations.

Logic of History

Take, for example, the first poem in this anthology. The poet refuses to cut himself adrift from life : his business, he says, is to subscribe to its urgencies, expose its crudities. and instead of succumbing to the death-wish, to go forward towards a realisation of that ideal which will give meaning and beauty to life. This, to me, is the real logic of history as contrasted with our brainsburns' mood of despair and cynicism, that is to say, their logic of reaction which is a product of their failure to see things in the correct historical perspective. Poets like Mr. Ghose offer a good antidote to the pathological attitude expressed in such words as 'I was born and

* SAVITRI.

once is enough', and there is no doubt that in this our age of transition there is the need, the most urgent need of driving out pessimism and helping humanity reach forward to the light of a new dawn. It is, I think, a very strong testimony to Mr. Ghose's abilities as a poet that an age of passimism and jejune worship of beauty through escapism, he possesses a rigid intellectual backbone, a conviction which is scientific and yet a source of inspiration for poets at least so long as it remains unattained.

Piercing Lyric Cry

I have come across in these poems of Mr. Ghose's many of the elements latent in any good literary creation: well-chosen words, lively rhythm, a good combination of pictorial and musical qualities, and above these all, the light of conviction which is no propaganda by virtue of its happy wedding with the emotion of beauty. Mr. Ghose is indeed an acesthete among intellectuals and an intellectual among aesthetes. Despite their modern outer trappings his love poems, which abound in this anthology, are not out of line with their predecessors: their theme is as ever, "eternal passion, eternal pain." The quality of Mr. Ghose's lyric cries is quite as piercing.

Poems of Love

One extract from a love poem in the anthology to show that even when looked in the arms of his beloved the poet does not lose sight of the contrast of his experience and that of those wading through life's woes:

"The night wakes up
as the cuckoo coos,
And behind dark clouds peeps
the pallid moon.

Beloved, you're in my arms
locked:
Think of those who squat
on the dusty road,

Empty their arms, and
Sleepless with pain
How light must be your own
tale of woe!

Take another which is a cynical but delightful estimate of domesticated love:

"Not for your ears my song
 of love,
I'm so luckless, beloved.
For life's load sits heavy
 on my back.
Not for me the crown of
 flowers yet,
Mine have been songs of
 dolorous woes.
I fear the arrows of fun
You would pierce my love song
 through;
That's why, dear, I chose you
 for wife, not lover".

And yet the poet is not altogether an anti-romanticist:

"When coos the cuckoo of spring
Its song piercing my tiredness,
I remember, I remember
But I do not know, whom.
No time for remembrance,
Spring flies fast
O'er my mind locked in worries;
And the music of the bird
Echoes still in forests;
I prick my ears for it
Amid my worry and my work."

Mr. Ghose's poems of love lack the psychological acumen of a Donne or the robust optimism of a Browning. Nor do they take the reader away to the far-off ivory tower of a never-never land. Their business is with life, the life of the middle-class Bengali intelligentsia of the day and the charm of his love poems lies in his capacity to distil beauty out of the commonness, rather the drabness of life, as he sees it. One more quotation which bears out this commentary:

"The cuckoo's song sent
 me searching for love,
But baffled I had to return:
And I've cursed myself oft,

For in my love-lorn moments
I couldn't work and so lost pay.
It's a pity life's ebb and flow
Moves not to the dial of the clock.
And sudden has been the impulse
Mind received from
cuckoo's song!

The above lines, though applicable to a particular class, do not necessarily leave out others who have loved and known, as the poet has, how very sudden the impulse is, how very lawless and indisciplined. Mr. Ghose, therefore, has succeeded in rising from the particular to the universal and that is exactly what any poet worth the name has got to do.

BIMAL GHOSH : An Aesthete Among Intellectuals :
—*The Peoples Weekly* : 18.2.1951

কাব্য-সাধনার তৃতীয় দশক : ১৯৫১-১৯৬০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"তোমার বই যথাসময়ে এসেছে এবং পরমানন্দে রসাস্বাদন ক'রে ধন্য হয়েছি। তোমার মধ্যে সেই ভাবগাম্ভীর্য আছে—যা সমস্ত কিছুকে একটি মহিমা দিতে পারে। একদা ছিল সূর্যালোকের মত উষ্ণ প্রসন্ন-দীপ্ত তা'র রূপ। সে রূপের যদিও পরিবর্তন ঘটেছে তবুও তা'র দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কালবৈশাখীর পিঙ্গলকৃষ্ণ তা'র রূপ এখন দিগন্ত ব্যাপ্ত করার মত প্রসার-আকুতি তার অবয়বে এবং আত্মায়। তাই আমি তোমার অনুরাগী মুগ্ধ পাঠক। ভক্ত বললে যদি বিব্রত না হও, তবে তাই।"

—পত্রাংশ : ২১শে জানুয়ারী ১৯৫১

রাধারাণী দেবী

"বিমলচন্দ্রের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা নিঃসংশয়িত উচ্চ। যে বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী হলে সর্বপ্রকার কবিতাই স্বচ্ছন্দ-অবলীলাক্রমে লেখনীর মুখে উৎসারিত হয়ে আসে—কবি বিমলচন্দ্র সেই প্রশস্ত সামর্থের অধিকারী। অল্প বয়সে রবীন্দ্রযুগের কবিরূপে উদিত হয়ে তিনি অতি সহজ পদক্ষেপে রবীন্দ্রোত্তর যুগ উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতি আধুনিক কাব্যক্ষেত্রে তাঁর কবিতা স্বপ্রতিভা-প্রতিষ্ঠ। আধুনিক যুগের ভঙ্গী, আঙ্গিক, গুণ ও লক্ষণা-ক্রান্ত তাঁর কবিতা কেবলমাত্র আধুনিকপন্থী কবিদেরই নয়, পূর্বযুগীয় বা প্রাক-আধুনিকপন্থী কবিদের নিকটেও স্বীকৃতি-সম্মান লাভ করেছে। এ গৌরব তাঁর প্রাপ্য। বিমলচন্দ্রের নিটোল-নিঃখুঁত কবিতাগুলি আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতায় গভীর সংবেদনশীল। তাঁর কতকগুলি উপহাস-তীব্র-সুতীক্ষ্ন কবিতা মর্মান্তিক বেদনা-করুণ অথচ কৌতুক ঝলকিত। এই কবিতাগুলি

আধুনিক বাংলা কাব্যে গর্বের সামগ্রী। রবীন্দ্রোত্তর যুগের নব্য রীতির বাংলা কবিতা সম্বন্ধে যাঁদের মনে বিরুদ্ধধারণা বদ্ধমূল,—কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি।"

—হিন্দুস্থান পার্ক ১১-৪-৫১

নরেন্দ্র দেব

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে ক'জন শক্তিশালী কবি আমাদের কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন,—যদি বলি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁদের অন্যতম তাহ'লে বিমলচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে। সকল দিক থেকে বিচার ও বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হবে বিমলচন্দ্র এ যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি। তাঁর রচনায় কোনো কৃত্রিমতা নেই. এমন স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল প্রজ্ঞার বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারুর মধ্যে পাই না।

—হিন্দুস্থান পার্ক ১১-৪-৫১

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দেহে মনে যখন নিরাশার স্তূপ চেপে বসেছে, কোথাও একটু আলো পাইনে, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' আমাকে চাবুক মেরে চাঙ্গা করে তুলল। দেখলাম মরিনি, ভিরমি গেছি। তোমার কলম অক্ষয় হোক, আমার মত নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করুক।

—৪ঠা বৈশাখ ১৩৫৮

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

"...'উদাত্ত ভারত'! বলিষ্ঠ একটি ঘোষণা নামের মধ্যেই নিহিত। বলিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে কবিতার ছত্রে ছত্রে। অবিশ্যি, বলিষ্ঠতা বলতে কি বোঝায়, এই নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বইখানি যিনি আদ্যোপান্ত পড়বেন, তিনিই স্বীকার করবেন, সামগ্রিকভাবে কবিতাগুলো স্বর্গমর্ত্যরসাতলকে আলোড়িত করেছে। এই তিনটি স্থানের আয়তনকেই কেবল আলোড়িত করে নি, কালের সাধারণ গ্রাহ্য তিনটি আয়তনকেও আলোড়িত করেছে। অর্থাৎ, কবিতাগুলির ব্যাপ্তি এতই বৃহৎ যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। গীতিকবিতায় যেখানে যত রস আছে, মনে হয় সমস্ত রসই এই সঙ্কলনে উপস্থিত। সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে প্রায় সোয়া দু'শো বাছাই কবিতা : ১৯২৬ থেকে ১৯৫৬—এই ত্রিশ বছরের অক্লান্ত কাব্যসাধনার ফলশ্রুতি। এবং এই কেন্দ্রীয় কাব্যমালঞ্চের প্রত্যেকটি কবিতায় নব নব চিন্তা ও উপলব্ধি রয়েছে।

কবিতাগুলির নানাপ্রকার ছন্দের বিচার করতে হলে আলাদা একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। কাজটিও দুরূহ। তবে এটুকু প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, বিমলচন্দ্র ঘোষ ছন্দের যাদুকর। আর শব্দ চয়নের কথা যদি বলেন। সমসাময়িক একজন অনুজ কবি হিসেবে ন্যায়ত আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে বর্তমান যুগে বিমলচন্দ্র ঘোষের জুড়ি নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই এই উক্তি করছি। এবং শব্দ বলতে বিদেশী শব্দচয়নের কথাও আমি আনছি না। ভারতবর্ষের নিজস্ব যত শব্দ উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি, তাদের কথাই বলছি। সম্ভবত ভারতীয় শব্দ চয়ন করে সহজবোধ্য কবিতা লেখার জন্যই বিমলচন্দ্র ঘোষ এত জনপ্রিয়। তাঁর কবিতাগুলি মনোজয়ী। এবং মনোজয়ের স্থান মনোহরণের অনেক ঊর্ধ্বে। কবিতাগুলিতে সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণের

মিশ্র রূপটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। এরই নাম মহৎ কাব্য। প্রাণের জ্যোতির্ময় বিকাশ।

জনপ্রিয়তার কথাই যখন উঠল, নিরন্তর একটি জিনিস আমি ভাবি যে, আধুনিক কবিতা জনপ্রিয় নয় কেন? সমস্যাটা বর্তমান কালের সমস্ত কবির কাব্যের জীবন-মরণ সমস্যা। প্রকাশকেরা কাব্যগ্রন্থ ছাপতে কেন দু'পা পিছিয়ে আছেন? সমসাময়িক কবিদের বই কেন সংস্করণের পরে সংস্করণ হয় না?

পাঠক-পাঠিকার শিক্ষা, কল্পনা, সংস্কার ও বুদ্ধির উপর যতই দোষারোপ করি-না-কেন, দোষটা যে অনেকখানি কবিদেরও বটে—এটা কিরূপে অস্বীকার করি। অবিশ্যি এ যুক্তিটার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই হয়ত বলবার আছে। তবু এটাও তো স্বীকার্য যে, পাঠক-পাঠিকার কাছে আধুনিক কবির হৃদয়-নিবেদনে কোথায় যেন গলদ রয়েছে। নইলে গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের টোপ যে রসিকজন সহজেই গেলেন, তিনি কবিতার চার দেখলে কেন পালান? যতই দিন যাচ্ছে, ততই কবিতার পাঠক-পাঠিকার ভিড় হু হু করে কমে যাচ্ছে। এ অবস্থার শীঘ্র প্রতিকার না-হলে শেষে ভিড়ের মাঠ একেবারেই ফাঁকা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশকেরা কবিকে নির্মমভাবে গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকের কয়েক স্তর নিচেই যেন নামিয়ে এনেছেন। বাজারে আজকাল গল্প বা উপন্যাস লেখকেরই অধিক সম্মান এবং অধিক দক্ষিণা। অথচ, ভেবে দেখুন, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে কবিদের এমন দুর্দিন তো আগে ছিল না। পৃথিবীর সকল দেশেই কবির কত সম্মান ছিল আগে আগে। এদেশেও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে কালিদাস হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা অধিকাংশই মুখ্যত কবি। অতএব, এ ব্যাপারে কবিদের এখন থেকেই সক্রিয় আন্দোলনে নামা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কবিদেরও এমন লেখা লিখতে হবে, যাতে তিনি জনচিত্ত জয় করতে পারেন সহজে। এবং এখানেই আসছে সহজবোধ্যতার কথা। কবি বিমলচন্দ্র এ বিষয়ে পুরোমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল।

'উদাত্ত ভারত' এমনই একখানা সঙ্কলন, যা দিনের পর দিন পড়লেও ফুরোয় না। বইখানি তিনদিন ধরে অনবরত পড়েও আমি ফুরোতে পারলাম না। তাই তীরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে দেখলাম :

দেশকাল পাত্রজোড়া আমার উদ্দাম কল্পনার
বিন্দু তুমি মহাসিন্ধু অশ্রুসিক্ত সৃষ্টির যন্ত্রণা
অন্তহীন শান্তিহীন উষায় প্রভাতে,
আমার অশান্ত মনোবিপ্লবের আঘাতে আঘাতে
জন্ম হল ধরিত্রীর ইতিহাস শত-শতাব্দীর
আমারি সৃষ্টির রঙে যুগ যুগ রঞ্জিত অধীর। (সমুদ্র)

* * *

কত রাত্রি ফসফরাসের মত জ্বলতে দেখেছি তার স্মৃতিপুঞ্জ
ঝড় থেমে যাওয়া গাঙের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। (উত্তরাকাশের তারা)

কাব্যের এই উত্তরঙ্গ সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম কবির অভীষ্ট উত্তরাকাশের তারাকে। এই তারা তো সাধারণ তারা নয়। ইতিহাসের দিক-নির্ণয়কারী রক্তাগ্নিদেহ ধ্রুবতারা।

হঠাৎ সে গম্বুজ তলিয়ে গেল
অগণিত গ্রাম জনপদের প্রাণ-জাগানো মহাগঙ্গায়।
সমুদ্রগামী গাঙের একূল ওকূল জোড়া ঘোলা জলে
উজ্জ্বল আলোর চূড়াটা ফাৎনার মতো দু'একবার কেঁপে তলিয়ে গেল।
(উত্তরাকাশের তারা)

উনিশশ' আটচল্লিশ সালের মে মাসের একটি রাত্রি। আমরা সবাই ঘুমিয়ে আছি। কিন্তু কবি জেগে বসে আছেন কেন? বুঝি তিনি কবি-ধাত্রী। অন্তঃসত্ত্বা নৈশ পৃথিবীর পুত্র-প্রসবের মত ঊষালগ্নে অন্য এক সূর্য-প্রসবের অপেক্ষা করছেন।

কোন আশাবাদী নাকি বলেছিল
প্রত্যেক রাত্রেই পৃথিবী অন্তঃসত্ত্বা হয়
টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে তার স্তন পাকাফসলের রসমাধুর্যে।
গুরু নিতম্বের মন্থরতায়
চোখের কোলের কালিতে
পার্থিব সম্ভাবনার রাত্রি থমথম করে।
আশাবাদী বলেছিল রাত্রি ভোর হবে। (সূর্য উঠবে)

আবার দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় এই কবিই আর একদিন রাত্রি জাগতে জাগতে লিখছেন :

তারা খসে যায়,
ও কি কোনো হতভাগ্য বিদেহ-কবির
গ্রহচ্যুত শিলীভূত খসে-যাওয়া জ্বলন্ত পাঁজর?
পৃথিবী প্রসুপ্তিমগ্ন। নিরবধিকাল।
এখনো বল্মীক স্তূপে 'মরা মরা' জপে রত্নাকর। (ছন্দপতন)

কবির একটি ভারী মিষ্টি প্রেমের কবিতার নমুনা দিচ্ছি :

তুমি বলেছিলে আসবে সবাই ঘুমালে
প্রাণপদ্মের মৃণালে।
তুমি বলেছিলে চাঁদ ডুবে গেলে
শেষ-রজনীতে সংসার ফেলে
নীল জ্যোৎস্নায় হংসমিথুন অলসপক্ষ ভাসালে,
তুমি বলেছিলে আসবে আকাশ ঘুমালে। (বিভাসা)

'উদাত্ত ভারত'-এর কবি কী নিয়ে কবিতা লেখেন নি? এশিয়া, জম্বুদ্বীপ, পলাশী, সুয়েজখাল, প্রাচীন মিশর, টাসমানিয়া প্রভৃতি দেশ ও বিশেষ জায়গা নিয়ে প্রথম পর্ব বা অধ্যায়ের কবিতাগুলো। দ্বিতীয় পর্ব বাল্মীকি, বেদব্যাস, দ্রৌপদী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক কবি ও ব্যক্তিদের নিয়ে। তৃতীয় পর্বে এসেছে ইঞ্জিন, হাওড়ার ব্রীজ, বেতার, পারমাণবিক, যান্ত্রিক প্রভৃতি ভারী শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক কবিতা। চতুর্থ আর পঞ্চম পর্ব বড়ই স্নিগ্ধ। ছন্দের নানা নিরীক্ষা-পরীক্ষা। পঞ্চম পর্বে প্রজাপতি, ফড়িং, কাকাতুয়া, জোনাকি, পারাবত প্রভৃতি প্রাণীবিশেষকে নিয়ে লেখা। ষষ্ঠ সর্গ

মূলত প্রেমের কবিতা দিয়ে ভরতি। 'বিভাসা' লেখার পর 'জয়মতী' কবিতায় প্রেম রূপান্তরিত। যাকে বলা চলে মহৎ প্রেম। অবিশ্যি, 'বিভাসা' লেখার বহু বছর পরে 'জয়মতী' কবিতা লেখা হয়েছে। সপ্তম সর্গে এক একটি করে বার মাসের উপর কবিতা লেখা আছে। ছন্দের কারিগরির সঙ্গে বাচ্যার্থের প্রসাদগুণ লক্ষণীয় :

টইটম্বুর দিঘিভরা
শাঙন মেঘের জলঝরা
শূন্য-কুটির দীপনেভা ঘরে
যক্ষবধূর মন মরা॥ (শ্রাবণ)

অষ্টম, নবম, দশম পর্বে কবিতাগুলোর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত একাদশ পর্বে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির চরিত্রের উপর শ্রদ্ধার্ঘ। দ্বাদশ পর্বে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, যথা, সাবিত্রী-সত্যবান, তিলোত্তমা, উমা প্রভৃতিকে নিয়ে কাব্যাঞ্জলি। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে কবিতা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ নতুন যুগের কবি, একথা বলার বোধ করি প্রয়োজন নেই। যখন-তখন সাময়িকীগুলির পৃষ্ঠা খুললেই তাঁর লেখা চোখে পড়ে। এত অজস্র রচনা। সকলেই জানেন, তিনি আবার প্রথম শ্রেণীর গীতিকারও! মোটকথা, তিনি আমাদের প্রিয় কবি। তাঁর যুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বর জলদমন্দ্রস্বরে অনবরতই আমদের আশেপাশে ধ্বনিত হচ্ছে। যে-বলিষ্ঠ স্বর শুনলে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

হে ভারত,
আমি তোমার যুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বর,
আমি তোমার যুগযুগান্তরিত রক্ত-সমুদ্রের সৃজনোল্লাস!
তোমার কাঞ্চনজঙ্ঘার অতিকায় তুষার-পদ্মে
অগ্নিপক্ষ ভ্রমরের মত আমি গান গেয়েছি...(অকুণ্ঠ ভারত)

কবির সেই স্বরই কখনো ভালোবাসায় প্রগাঢ়, কখনো ঘৃণায় শাণিত, বিদ্রূপে তীব্র এবং ক্রোধে রক্তবর্ণ। সেই স্বরই সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে যখন শান্তির বাণী বহন করে ওড়ে, তখন,

আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে বিশ্বের মহাকাশে
রোমাঞ্চকর রজতশুভ্র পাখা
অবাধ অজেয় গতিবেগ তার মানুষের বিশ্বাসে
প্রেমচঞ্চল রাঙা দুই চোখে সোনালি চাঁদের রাকা। (বিশ্বশান্তি)

আবার সেই মুগ্ধ স্বরই বাংলাদেশের মাঠে দাঁড়িয়ে যখন আষাঢ়ের আগমনী গায়, তখন শুনতে কী মধুর লাগে :

বীজবোনা মাঠে মনোময়ূরীর নীলপাখা।
তুমি এলে রিম্‌ঝিম্‌ সোনায় সবুজে আঁকা॥
শস্যের সফলতা ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী।
পালক কাঁপায় নিশিগন্ধার রেণু মাখি॥ (আষাঢ়)

আমার সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, সংকলনখানি ঘরে ঘরে রাখার মত একটি যোগ্য বই। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে আমরা যেমন ভালোবাসি. তেমনি ভালোবাসার মত এটিও আর একটি। বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারে একটি অতি মূল্যবান সংযোজন এই সংকলনখানি।

নদীমাতৃক বাংলার রিক্ত নরনারীর জীবনে এখন দিন চলছে, না রাত চলছে, পাঠক-পাঠিকারাই তার বিচার করবেন। কিন্তু কবির কণ্ঠে শুনুন :

তোমায় ডেকেছি মা, নিবিড় তমসায়
ডেকেছি কতবার রাত্রি মুছে দাও!
দিনের আলো যে মা দেখিনি কতকাল
সে কথা মনে নেই। প্রাণের ঢেউ তুলে
জোয়ারে উতরোল তুমি কি ভাসাবে না
শুকনো মরা নদী? পদ্মা-মেঘনার
বিপুল বন্যার তাইতো রচি গান
তাইতো জেগে আছি নিবিড় তমসায়। (রুদ্র মল্লার)

—অগ্রণী : কার্তিক ১৩৬৩

"..Among the poets who are writing on peace the name of Bimalchandra Ghosh, who in my opinion is the leading poet of Bengal after Tagore, stands first. Some extracts from his poem "My Peace" (Parichaya Puja number) will show to some extent, in spite of my very poor translation, the superb quality of his poems.

In one stanza he writes :

Scattered over a part of the vast world,
In the land of my peace-pilgrimage,
In the richness of life's full vigour,
And dressed with coral banners,
Silent is my Meditation at the Kremlin,
Whose smokeless flame, defiant of heaven
Is burning, motionless, vigilant.
This love of mine
Is a peace-partisan incarnate,
Is Spring Eternal in whose garden
Upon blazing petals,
Burns infinite peace in a million,
Million flames.

Elsewhere he gives an epic touch to his poem, where he writes : :

Over the world my Peace Dove flies,
Across the infinite sky,

Upon wings silvery white,
On her sensational flight,
Her speed is irresistible,
Invincible for faith in people,
Her twin eyes crimson
Quiver in love like the golden moon.,
My Dove, after her bath of freedom
In Volga's streaming waters,
Carrying the pitcher of Peace
Betwixt rosy lips,
Sprinkles this twentieth century
On the river-valleys of the Rhine,
The Danube, the Seine, the Tiber
By rhythmic throbs of her wings.
Thro' the lands of China's farmers
Echoing to the bells of the Yak,
Touching the soya beans,
Kissing the flames of flowering paddy,
Soaring over the red snowy peaks,
In the sky of Manchuria,
My Dove of Peace flies,
In Peaking's victory-chariot.

Elsewhere the poet feels agitated:

They plunder my Peace
In the rubber-forests of Malaya.

And, lastly, he describes what peace is. Peace follows when life is secure and happy:

What a fathomless affection
On the coast of dream's ocean,
What a tender greenish shade
In those *Nandan* forests!
From the leafy bower,
Resounding with the cooing of pigeons,
My Peace calls for the sun-rays,
When it is noon.

—*New Trends in Bengal's Progressive Poetry*:
Cross Road: January 12, 1951

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

"...আমি আপনার কবিতার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। কিন্তু আপনার মত প্রথম শ্রেণীর কবির সমালোচক হবার যোগ্যতা আমার আছে কি?......সবেচেয়ে জনপ্রিয় কবি যে বিমলচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে কবিরা ছাড়া আর কেউ দ্বিমত হবেন

না বলেই আমার ধারণা।......আমরা জনকয়েক কাব্যামোদী মিলে মাঝে মাঝে আপনার কবিতার আলোচনা করি, আবৃত্তি করি। দিল্লীর প্রগতিপন্থী মহলে আপনি বেশ খ্যাতনামা কবি। অবাঙালীদের মধ্যেও। আমাদের অফিসের (Tass.) এক হিন্দুস্থানী সহকর্মী নরোত্তম নাগর (ইনি একজন প্রগতিশীল হিন্দী লেখকও) আপনার "ক্ষুধা" কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ করেছেন বহু আগেই। আমি তা জানতাম না। আপনি জানতেন কি? আপনার আরও অনেক কবিতা অনূদিত হ'য়ে হিন্দী পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এত ভাল কবিতা ওঁরা কোথায় পাবেন?" পত্রাংশ: ২রা জানুয়ারী ১৯৫২.. "হংস" পত্রিকার anti-repression number-এ "ক্ষুধা" ও আর একটি কবিতার হিন্দী অনুবাদ বার হয়েছে।...আপনার "ভুখা ভারত" দিল্লীর প্রগতিশীলদের মধ্যে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে। এখানে বর্তমানে আপনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঙালী কবি।"

—পত্রাংশ : ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫২

জ্যোতির্ময় রায়

"আপনার অনেক কবিতাই পড়েছি "ভুখা ভারত"ও পড়লাম। গত দশ বছর ধ'রে কবিতাকে আলোচ্য বস্তু বলেই জেনে আসছি, হঠাৎ উপভোগ্য বস্তু হিসেবে পরিবেশন করে আপনি চিত্তবিভ্রম ঘটিয়েছেন। বৃক্ষের বিস্তৃত সত্তার যেমন রূপান্তর ঘটে পুষ্পের রূপায়িত সত্তায়, আপনার হাতে তেমনি ক'রেই হয় রূঢ় বাস্তব থেকে রাজনীতি। কংগ্রেসী গণনেতাদের মতই গণকবিরা যখন প্রজ্ঞার বারবিলাস থেকে কাব্যের ফরমান দিচ্ছেন, তেমনি সময় আপনার গণবোধ্য কবিতাকে, কেবল তাই নয় রবীন্দ্রোত্তর যুগে এমন সুষ্ঠু সতেজ আবৃত্তি-যোগ্য কবিতাকে যদি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে নমস্কার জানাই, অনেকের চোখেই জাত যাবে জানি— তবে কিনা সেখানকার খোয়ানোকে আমি অর্জন ব'লেই মনে করি।"

—২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

"**তোমার বই পড়ছি। রোজ ভোরে পড়ি। আরো পড়বো। ইহা আমার গীতা, ইহা আমার চন্ডী।** বইখানি আমি কিনলাম। পরে দাম পাঠাচ্ছি। ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পাটনা শহীদ স্মৃতির ৭ জন শহীদের মূর্তি গড়েছেন। কাগজে ছবি দেখেছি। দেবীপ্রসাদ ভাস্কর, তুমি কবি। তুমি আরো মহীয়ান। তুমি তাঁর চেয়ে (আর্থিক দিক থেকে) দরিদ্র। 'উদাত্ত ভারত'-এর 'ফড়িং' থেকে বেদব্যাস একই সুরে বাঁধা। আমি কবিতা (আধুনিক) পড়ি না, কেননা বুঝি না। তোমার কবিতা বুঝি, কেননা তোমাকে বুঝেছি। তোমার চেহারায় তোমার কবিতা ধরা পড়ে যায়। যে ছেলেটিকে (বিজু) আমার কাছে দেখেছ, সে দিনে আমার এখানে ভাত খায়, রাত্রে ৭ ভাইবোনে মিলে এক পয়সার করে মুড়ি খায়। এরাই বিপ্লবের উপাদান। এদের শুকনো মরা হাড়ের ওপর মা কালী নৃত্য করবে, শিব প্রলয়ের ডমরু বাজাবে। তুমি তারি কবি। তোমার সহিত পরিচয়ে ধন্য হলাম।

—একখানি পোস্টকার্ড : ২৫।১১।১৯৫৬

সজনীকান্ত দাস

"বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিমলচন্দ্রের বিশিষ্ট স্থান। দুই স্বতন্ত্র ভূমিকায় তিনি কবিতা লিখিয়া থাকেন—সৃষ্টিধর্মী ও প্রচারধর্মী। মনের আনন্দে যেখানে

তিনি কাব্য সৃষ্টি করেন সেখানে তিনি জাতকবি, প্রাণের আবেগে বা সাময়িক ঘটনার অভিঘাতে যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি চারণ কবি। দুইয়েই তাঁহার সমান হাত। 'উদাত্ত ভারত'-এ দুই ধারারই নিদর্শন আছে। কিন্তু যে বিমলচন্দ্রকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, **তিনি স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে, নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথিবীর কবি। তিনি চিরন্তন মানুষের কবি।"**

—শনিবারের চিঠি : অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

নীরেন্দ্রনাথ রায়

"আপনার 'উদাত্ত ভারত' পেয়েছি মাত্র চার-পাঁচদিন আগে। আমি এখন সুদূর বিদেশে; তবুও আপনি আমায় মনে রেখে এত যত্ন করে বইটি পাঠিয়েছেন যে আমি তাতে অভিভূত না হয়ে পারি নি।...এই প্রথম পড়লুম আপনার প্রতিনিধিত্বমূলক কাব্য-সংগ্রহ। পড়ে বিস্মিত হয়েছি ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার সজাগ চেতনার বিস্তারে ও তার সাবলীল প্রকাশ-কুশলতায়। এখানকার একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের আয়োজনে, গত মার্চ মাসে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল—অবশ্য ইংরেজীতে—বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সম্বন্ধে। তাতে আমি আপনার কবিতায় বর্তমান বাংলার জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আনন্দ-বেদনার বহুভঙ্গিম প্রকাশের কথা বলি। তারপর মে মাসে যেতে হয়েছিল লেনিনগ্রাদে—বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। দু সপ্তাহ ধরে বাংলা সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করার জন্যে। সেখানে দেখেছিলুম এক ভদ্রমহিলা অতি যত্নসহকারে আপনার কবিতা অধ্যয়ন করছেন। 'প্রাভ্দা' পত্রিকাতেও আপনার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা থেকে রুশ অনুবাদে। এদেশে কবিদের সমাদর ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আনন্দ হয়; সেই সঙ্গে বেদনাও জাগে, কবে কতদিনে আমরা এই কাম্য অবস্থায় পৌঁছাতে পারবো!

—পত্রাংশ : মস্কো : ১-১০-১৯৫৬

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান বাংলার জীবিত কবিদের মধ্যে যে দু'জন কবি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, তাঁদের একজন কাজী নজরুল ইসলাম, অপরজন নিঃসন্দেহেই বিমলচন্দ্র ঘোষ। সমাজ-সচেতন কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভ্দা'য় বাংলা কাব্যের রুশী সংকলনে তাঁর বহু কবিতা সসম্মানে স্থান পেয়েছে এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'Encounter' পত্রিকাতেও তিনি সমালোচক কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছেন' এ সংবাদও বাঙালী পাঠকদের অজানা থাকবার কথা নয়।... যে যুগে অন্য কবিরা পরীক্ষা-নীরিক্ষার নামে পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের অন্ধ গলিতে ঘুরে মরছেন আর সেই জনবিমুখ ব্যর্থসৃষ্টির গর্বে আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করছেন, সেই একই যুগের কবি বিমলচন্দ্র কেমন করে অক্লেশে এমন সাবলীল, এত সুস্থ, এত বলিষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন? আন্তর্জাতিক মননের সুস্থ সুন্দর মহিমায় তাঁর কবিতাগুলি যেন জীবনকে মুঠোয় নিয়ে চলে। রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্য যেন বজ্রকঠিন প্রতিরোধ।..সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর কবিতায় নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার উৎস খুঁজে পাবে। প্রেমে, কর্মে,

চিন্তায়, সংগ্রামে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আমি আছি তোমাদের পাশেই, চারণ আমি, তোমাদেরই আমি সুখদুঃখমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর।... আমাদের দেশে একদল বুদ্ধিসর্বস্ব উন্নাসিক ব'লে থাকেন সর্বহারা জনগণের জন্য যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের কবিতা—কবিতা নয়, প্রচারমূলক শ্লোগানধর্মী কতকগুলো স্থূল কথার উচ্ছ্বাস মাত্র। কবি দৃপ্ত ভাষায় এঁদের জবাব দিয়েছেন :

"লেখনীতে রাঙা রক্ত ঝরাই প্রচারের অপবাদে
কালিঝুলি মেখে হীরা খুঁজি তবু কয়লা খনির খাদে
পাঁজর-জ্বালানো অসহ জ্বালায় জ্বলি
নীল অঙ্গারবাষ্পশিখার আকাশে বুলাই তুলি
কৃষ্ণমেঘের বুকচেরা রজনীতে
রেখায় রেখায় প্রলয়ের আলো ফুটে ওঠে বিজলীতে
মহান প্রচাবে গণমানসের মুক্তির সংগীতে।"

...আমাদের একান্ত বিশ্বাস বাঙালী এই বরেণ্য কবিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে দ্বিধা করবে না।

—বিংশ-শতাব্দী : অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

কুমারেশ ঘোষ

একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কুমারেশ ঘোষ 'উদাত্ত ভারত'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলেন, "উদাত্ত ভারতের ছোট ছোট সনেটগুলি, যথা : মনু, দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য. কর্ণ, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, মেনকা, দ্রৌপদী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদির বিষয়ে ছোট্ট করে বলি : এগুলি উদাত্ত-ভারত-সৈকতের এক-একটি মুক্তা-শ্রী!"

—যষ্ঠিমধু : মাঘ ১৩৬৩

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'উদাত্ত ভারত' আগাগোড়া পড়ে উঠতে পারি নি। কিন্তু যতখানি পড়েছি, তাতে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমি অনেকদিন থেকে আপনার লেখার পরম ভক্ত; একসঙ্গে এত লেখা পেয়ে সে ভক্তি যেমন বাড়লো, তেমনই দেখলুম তা অহেতুক নয়। আপনার উপরে বাঙালী পাঠকের দাবি এখনো মেটে নি এবং সেই জন্যে আপনার অস্বাস্থ্যের কথা শুনতে খারাপ লাগে। আশা করি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। 'উদাত্ত ভারত' উপহার পেয়ে যৎপরোনাস্তি গৌরববোধ করছি।

—পত্রাংশ : ৩০-১০-১৯৫৬

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

"...'উদাত্ত ভারত' বইটি পেয়ে খুব খুশী হলাম। বাংলা সাহিত্যের আসরে তোমার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে বহুদিন পূর্বে। এই সংকলনের অনেক কবিতা আগে পড়েছি এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।...তুমি শুধু শক্তিশালী কবি নও, শক্তিশালী ব্যক্তিও। বাইরের ঝড়-ঝাপ্টা তোমার প্রাণের প্রদীপটিকে নেবাতে পারে নি, কেবলমাত্র কবিতা লিখেই তুমি নিজেকে সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছ। এটা কম কথা নয়। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

—পত্রাংশ : ১২ই মার্চ ১৯৫৭

অজয় ঘোষ [সাধারণ সম্পাদক : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি]

"...আপনার কবিতা পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে আপনার অবদান অতুলনীয়। আপনার মতো প্রতিভাবান কবির রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমি আশা করি, আপনার মতো বলিষ্ঠ লেখক ও প্রথিতযশা কবি বাংলা কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিবে। আমি আন্তরিক-ভাবে আপনার 'উদাত্ত ভারত'-এর বহুল প্রচার কামনা করি।"

—পত্রাংশ : ১৭ই মার্চ ১৯৫৭

হুমায়ুন কবির

"...কিছুদিন হ'ল আপনার 'উদাত্ত ভারত' পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি হয়তো খবরের কাগজে দেখেছেন যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস আমার পক্ষে ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। এবং কাব্য সংকলনটির জন্য ধন্যবাদ জানাই নি সেজন্য ত্রুটি গ্রহণ করবেন না। আপনার কিছু কিছু কবিতা আগেও পড়েছি এবং এখন আবার পড়লাম। আপনার কবিত্বশক্তি অবিসংবাদী এবং আশা করি আপনার কাব্য-সাধনা উত্তরোত্তর সার্থক হোক। আমার দ্বারা যদি আপনার কোনো সাহায্য হয় জানাবেন, অবশ্যই আমি তা করবো। দুঃস্থ অথচ শক্তিশালী লেখকদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার আজ তিন-চার বৎসর হল বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে, আপনি যদি সে বৃত্তি পান তবে সাংসারিক অভাব খানিকটা দূর হবে। নিজে সাক্ষাৎভাবে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করে, অথবা প্রাদেশিক সরকার যদি ভারত সরকারকে লেখে—এই দুইভাবে বৃত্তি দেওয়া হয়। আপনি যদি বাংলা সরকারকে দিয়ে লেখাতে পারেন, সেটাই বেশী ভাল হবে, তবে নিজে আবেদন করেও অনেক সাহিত্যিক মাসোহারা পেয়েছেন। আপনি Ministry of Education, Govt. of India, Literary Pension এই নামে দরখাস্ত পাঠাবেন। আশা করি নববর্ষে আপনার ভাবনার বোঝা লাঘব হবে এবং অবিভক্ত মন দিয়ে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।"*

—পত্রাংশ : নিউ দিল্লী, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

কালিদাস রায়

"বিমলচন্দ্র বর্তমান যুগের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। তাহার রচনার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করে। মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ তাহার রচনাবলীকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা বিমল আদৌ গতানুগতিক নয়। বিমল প্রাচীন কাব্যধারার অক্ষরে অক্ষরে অনুবর্তী নয়, আবার বর্তমান যুগের বিজাতীয় ধারার প্রভাবে মুহ্যমানও নয়। তাহার রচনার স্বকীয়তা ও মৌলিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীতের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা রাখিয়া বর্তমানে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সে ভবিষ্যতের আশা-

---

* অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের চেষ্টায় বিমলচন্দ্র ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক ১৫০৲ টাকা বৃত্তি পান। এই বৃত্তি মঞ্জুরের জন্য বাংলাদেশ থেকে জোরালো সুপারিশ করেন : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহাররঞ্জন রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও আমেরিকা থেকে অমিয় চক্রবর্তী।

আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে বাণীরূপ দিয়াছে। এ দেশের কাব্য-সাহিত্যের যুগসন্ধির ইতিহাসে বিমলের কবিতাবলী যথেষ্ট উপাদান যোগাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

—সন্ধ্যার কুলায় : ৪-৩-১৯৫৭

SUNITIKUMAR CHATTERJI

"....Some months ago I had an opportunity to come in touch with some of his writings and I had been very much impressed by his poetical genius. He has a wide sweep in his approach to the facts and problems of life; and not only he has the seeing eye, which sees life as it is and also can see visions which are vouchsafed to true poets, but he also has the power of expression of a rare order. From both content and form Sri Ghosh is a remarkable writer, and all lovers of poetry and appreciators of good literature in Bengali are captivated with his poetic contributions. There is an atmosphere of culture which is one of the most refreshing and easily understandable characteristics of his verse."

—13*th March* 1957

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

"আপনার কবিতা যত ভাল লেগেছে, তার থেকেও অনেক বেশী ভাল লেগেছে আপনার মানুষটিকে। সংসারে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, যারা আসে আর যায়—মনের গভীরে কোন রেখাপাতই করে না। হঠাৎ হঠাৎ দু'এক জনকে মুহূর্তের জন্যে কাছে পাই যারা সমস্ত হৃদয়কে অধিকার ক'রে রাখে। কবি বিমলচন্দ্রকে দেখে অনুভব করলুম যে বহুদিন পর আবার যেন একটা তাজা, জীবন্ত মানুষ দেখলাম।

"আপনার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যাই। নূতন যুগ-ভাবনার স্বাক্ষর আপনার কাব্যে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও তেমনটি পাই নি। আপনি দিল্লী থেকে ফিরে এলে আপনাকে *The Origins of the National Education Movement বইখানি দেব।......আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।"

—পত্রাংশ : ২৯-৩-৫৯

উমা মুখোপাধ্যায়

..."আপনার কথা শুনে ও আপনার কবিতা পড়ে কবিকে ভাল লেগেছিল; কিন্তু আপনাকে দেখে ও আপনার আবৃত্তি শুনে কবিকে ভালবেসেছি। মাত্র ঘণ্টা খানেকের আলাপে মানুষ যে কি ক'রে দূরকে নিকট ও পরকে বন্ধু করতে পারে, তা আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। আমি 'মোটা' মানুষ, কবিতা ভাল বুঝি না। এর ভাবের বিন্যাস, কি ছন্দের চুলচেরা হিসাব, কিম্বা তত্ত্বের

* বইখানির জন্য অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় ১৯৫৯ রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন।

দার্শনিক বিশ্লেষণ আমার নেই। কিন্তু আছে রসোপলব্ধি। যে কবিতা সঙ্গীতের মতো আমার মনের তন্ত্রীতে ঝংকার না তোলে, তাকে আমি কবিতা-পদবাচ্য মনে করি না। এক কথায় শুনেই যা ভাল লাগে, শুধু ভাল লাগে না, ভাল লাগার পরেও মনে যার রেশ রেখে যায়, যা থেকে আসে 'আবার শোনা', 'আরো শোনার আকাঙ্ক্ষা', তাকেই যথার্থ কবিতা বলা চলে। এদিক থেকে বিচার ক'রে আধুনিক কবিতার প্রতি আমার ছিল বরাবরের একটা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। না বুঝি এর ভাব, না বুঝি এর ভাষা, না বুঝি এর রস।

সেদিন আপনার গম্ভীর উদাত্ত স্বরের খান কয়েক কবিতার আবৃত্তি শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। 'টুপ্ টাপ্' ও 'হাওড়ার ব্রীজ'-এর সুর এখনও হাওয়ায় ভেসে কানে বাজছে। আপনার কবিতার সুরঝঙ্কার ও ছন্দ-চাতুর্য, বর্ণবৈচিত্র্য ও ভাবের বিশালতা, সর্বোপরি এর মধ্যে প্রতিফলিত কবির যে তেজোদৃপ্ত ও আদর্শবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' পাঠকের মনকেও সংক্রামিত করে। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে ভুল-বোঝা আমার দূর হ'ল। এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।"

—পত্রাংশ : ২৯শে মার্চ ১৯৫৯

J. B. MOITRA

Rakta-Golap or Crimson Rose is a remarkable collection of poems in Bengali. The poet Bimalchandra Ghosh has already carved for himself an honourable place in the hearts of the Bengali people.

The reason are not far to seek. The poverty and hunger of the masses of our people, the brutal exploitation to which they are subjected and the filth and squalor that surrounded their daily life are powerfully portrayed in his poems.

But he is not a poet of pessimism. On the contrary, he sings, in a full-throated voice, of the hopes and aspirations of the people, of their struggles against the evils of the present social order and for a new system where they will be their own masters.

He lashes out against the hypocrisy, chicanery and brutality of the capitalists and other vested interests. But his indignation and biting sarcasm against the exploiting classes do not end up in the blind alley of impotent rage and bitterness.

This is so because he is supremely confident that the future belongs to the people. And it is this unflinching confidence that lends a lofty militant tone to his poems. His words and metaphors go home like sharp rapier-thrusts.

Bimalchandra Ghosh has been a prolific writer. He has consistently preached progressive ideas. But his progressivism is not of the brittle type. He is one of the Left-minded middle-class intelectuals who have never been swayed by

bourgeois propaganda regarding certain international and national developments in recent years.

If "creative writing means thinking in images" (Kuo Mo-jo), Bimalchandra Ghosh is certainly one of the outstanding creative Bengali poets of to-day. A whole world of ideas are packed into his picturesque imageries. Yet, fancies and thoughts are never allowed to "break through the language and escape."

The poems in the book under review were written between 1943 and 1957. The year 1943 still recalls the nightmarish memories of the terrible Bengal famine, which took a toll of 35 lakh lives. A tragedy of such dimensions could not but leave a deep impression on a highly sensitive poet like Ghosh.

It is not, therefore, at all surprising that he should endeavour, in these poems, to delineate the vast turmoil and the grim tragedy of this momentous period which, incidentally, corresponds to the latest phase of his evolution as a poet.

One of the striking features of the poems is the technique adopted by him to communicate his thoughts and feelings. Not only that themes are novel; the form—prose-poem, which was created and developed into an exquisite literary technique by poet Tagore—is surprisingly refreshing.

The present collection is divided into two sections—the first deals mainly with love; the themes in the second are primarilly social and political. Both the sections, however, are closely interlinked.

—*Remarkable Collection of Bengali Poems*:
New Age (Weekly) 15.11.1959

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

"...রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এসে বেদনার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি, সমাজের একেবারে নীচের তলায় যাদের বাস তাদের জীবনকথার তিনি বাণীরূপ দিতে পারেন নি।...... তিনি জানতেন :

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন তা তিনি পর্যাপ্তভাবেই আমাদের দিয়েছেন, ফাঁকি দেন নি। তিনি তাঁর সুরের অপূর্ণতা সবিনয়ে স্বীকার করে গেছেন। যে কবি কৃষক-মজুরের অত্যন্ত কাছে, যাঁর সঙ্গে তাদের নিকট-আত্মীয়তা, তিনিই এসে সবহারাদের কথা শোনাবেন, এই আশা নিয়ে কবি সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন

ভবিষ্যতের দিকে, জনজীবনের সেই কবির বাণী শোনবার জন্যে তিনি কান পেতে বসেছিলেন। তাইতো তিনি জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় দাঁড়িয়ে অনাগত দিনের জনজীবনের যুগকবিকে বারংবার নমস্কার জানিয়ে গেছেন। চল্লিশোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুপ্রতীক্ষিত জনমানসের কবির সন্ধান পাওয়া গেল সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষের মধ্যে। বাংলা কাব্যে আরম্ভ হ'ল নব যুগ। যে নূতন জীবনবোধ ও জীবনদর্শন নব যুগের বনিয়াদ তা'র প্রধান পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি বিমলচন্দ্র ঘোষ। এই জীবনবোধ ও জীবনদর্শনের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য 'উদাত্ত ভারত' ও 'রক্তগোলাপ'।"

—তরুণদের মুখপত্র : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা : মাঘ ১৩৬৬

নারায়ণ চৌধুরী

"...আপনি আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের একজন অনন্যসাধারণ শক্তিধর প্রতিনিধি। আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার ঐক্য না থাকলেও, আপনার কাব্য-প্রতিভাকে আমি মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা করি জানবেন। আপনার শব্দের উচ্ছলতা ও প্রাচুর্য, ছন্দোবৈচিত্র্য, বাগ্‌ভঙ্গীর সংহতি ও ধ্বনি-সম্পদ আধুনিক বাংলা কাব্যের এক ঐশ্বর্যবিশেষ। এই অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্বোধ্যতা ও 'ফ্যাসনেবল্‌' কাব্যবিলাসের যুগে আপনাদের মতো দু'একজন ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবির রচনায় বাংলা কাব্যের ধ্রুপদী রূপ বেঁচে রয়েছে। আপনার কবিতায় অনুভূতির গাঢ়তা ও প্রাবল্যের কোন অভাব নেই। লোকে যদি আপনার কবিতাকে কিঞ্চিৎ বহির্মুখী বলে তা'তে আপনি বিচলিত হবেন না, ওইটেই আপনার কাব্যের এক বিশেষ গৌরব।"

—পত্রাংশ : ৩০শে আগস্ট ১৯৫৯

আবদুল হালিম

"শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্য-প্রতিভার গুণনির্ণয়, বিচার এবং মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের বয়স ছেচল্লিশ বৎসর। তিনি এই ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, আধুনিক কালের কোন কবিই তত কবিতা রচনা করেন নাই। বিমলচন্দ্রের 'উদাত্ত ভারত' শুধু ত্রিশ বছরের কাব্য সংকলন নহে —ইহা হইতেছে কবিতার মাধ্যমে বহু শতাব্দীর বিশ্ব পরিক্রমা। ত্রিশ বছরের কবিতা রচনায় দুনিয়ার বহু শতাব্দীর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—ঘটনাবহুল বিচিত্র কাহিনী, জীবনালেখ্য, দর্শন, মনঃস্থিত বিষয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং সামাজিক চিন্তাধারাকে কাব্যরসে রূপায়িত করিয়া তিনি যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং অভিনব কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব!......অভ্রভেদী হিমাদ্রিশিখরের মত বিমলচন্দ্রের 'উদাত্ত ভারত' মহান বিশ্বের বিপুল সৃষ্টির সাক্ষীরূপে বিরাজিত। শুভ্র তুষার-কিরীট হিমালয় শিখর হইতে 'উদাত্ত ভারত'-এর আহ্বান অগণিত মানুষের মনে এক নূতন সৃষ্টির সেতুবন্ধ রচনা করিবে। 'উদাত্ত ভারত'-এ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে নবযুগের আগমনী। 'উদাত্ত ভারত'-এর কবিতাগুলি মানুষের মানসলোকে এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করিবে। মানবচিত্তকে নূতন প্রাণরসে পূর্ণ করিয়া মহান ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান দিবে।......প্রতিভায় এবং স্বকীয়তায় তিনি বিপ্লবী কবি হিসাবে বঙ্গ সাহিত্য এবং কাব্যগগনে চিরদীপ্তিশীল থাকিবেন।......ত্রিশ বছর আগে সাধারণ এক মানবপ্রেমিক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কবি বিমলচন্দ্রের যাত্রা শুরু হইয়াছিল

—তাঁহার সে যাত্রাপথ সেদিন তাঁহার নিকট সুস্পষ্টও ছিল না। কিন্তু বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আজ তিনি প্রকৃত প্রগতি-শীল মুক্তিকামী শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদকেই জীবনের ব্রত করিয়া নিয়াছেন। তাঁর জীবনের এই বিচিত্র পরিক্রমা তাঁহাকে সাধারণ মানবপ্রেমিকের স্তর হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা ও সৌভ্রাত্রের স্তরে পেঁাছাইয়া দিয়াছে।...বিমলচন্দ্র মূলতঃ নিপীড়িত নির্যাতীত মেহনতী মানুষের কবি।"

—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও কাব্য : উদাত্ত ভারত : স্বাধীনতা ঃ
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

* * *

"অর্ধশতাব্দী অতিক্রম ক'রে আপনি পঞ্চাশে পদার্পণ করেছেন। আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা কচ্ছি। আপনি সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে অর্ধশতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহকে পিছনে ফেলে অনাগত ভবিষতের সাফল্যের জন্য আপনার কাব্যপ্রতিভাকে বিকশিত করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যগগনে আপনার কাব্যপ্রতিভা শতপুষ্পদলে বিকশিত হয়ে ভারতের বুকে সর্বমানবিক স্বাধীনতা অর্জনে প্রেরণা দিবে।

আপনার অগ্নিগর্ভ বাণী, আপনার প্রাণস্পর্শী কবিতা, আপনার সাহিত্য, আপনার বিপ্লবী কণ্ঠের অমোঘ ঘোষণা সমাজতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার পথে নতুন প্রেরণা, উদ্দীপনা ও উৎসাহ যোগাবে। আপনার কণ্ঠে আবার নতুন ক'রে বিশ্বমানবিকতা, সাম্য ও স্বাধীনতার উদাত্ত সুর বেজে উঠুক। আপনি সাহিত্যের বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে আমাদের চলার পথের প্রেরণা জুগিয়েছেন। দুঃখ-দারিদ্র্য আপনাকে সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচলিত করতে পারে নি। আপনার মত সহৃদয়, মহানুভব দেশপ্রেমিক কবির সাধনা, মহান ত্যাগ, দারিদ্র্য, অনশন, কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে পারে না।

নবীন প্রভাতের অরুণোদয়ের মতো আপনার কাব্যের সৌরভ সমস্ত দিগন্ত সুরভিত করবে। সত্য ও সুন্দরের পূজারী তাঁর যোগ্য আসন পাবেন। অদূর ভবিষ্যতে যেদিন ভারতের বুকে সর্বমানবিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, সেদিন আপনার কথা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বলভাবে লিখিত হবে। এক-মাত্র শোষণবিমুক্ত সমাজেই সৃজনশীল সাহিত্য সমাদৃত হয়। আজ আপনি সমাজতন্ত্রের আলোকে আপনার কবিতার মাধ্যমে ভারতের অগণিত মানুষের সামনে যে নূতন পথের নিশানা তুলে ধরেছেন তা'র জন্য তা'রা আপনার কাছে চিরঋণী থাকবে। আশা করি আপনি নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটিকে ত্বরান্বিত করবেন।

—অভিনন্দন পত্র : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৯

প্রবোধকুমার সান্যাল

"তোমার বই (উদাত্ত ভারত) মাথায় তুলে নিলুম। তোমার খবর শুনেছি— কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি অবিলম্বে নিরাময় হ'য়ে ওঠো। মাত্র দশ টাকা! (শোভন সংস্করণ) এযে লক্ষ টাকার বই! টাকা তোমাকে চেয়ে নিতে হোলো! অনেকেই থাকবে না একদিন কিন্তু তুমি সেদিন থাকবে আপন

প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে! তোমার আগেকার সুস্থ সুন্দর সবল দেহ ও মন নিয়ে ফিরে এসো। পথ চেয়ে রইলুম।"

—১২-৯-১৯৫৬

*   *   *

"তোমার 'উদাত্ত ভারত'-এর পর আজ আবার 'রক্তগোলাপ' পেলুম। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে উদ্বেগ বোধ করি। ভয় হয়, যথার্থ প্রতিভা হয়তো বা এবার শুকিয়ে গেল! তোমার অনুরাগী আছে প্রচুর, কিন্তু তুমি কথার কারচুপির দ্বারা স্তাবক সৃষ্টি করতে পার নি। প্রভাবশালী দু'চারজন সাংবাদিক-বন্ধু তোমার হাতধরা থাকলে তোমাকে হয়ত বা মোটা পুরস্কারও পাইয়ে দিত। 'রক্তগোলাপ' বিশেষ মনোযোগের সঙ্গেই পড়বো। একথা জানি, মাত্র দশটি টাকা পাঠিয়ে দিলে তোমার বইয়ের দাম দেওয়া হয় না। কিন্তু তোমার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল এই সামান্য নমস্কারীতে।"

—পত্রাংশ : ১৯৫৮

বিষ্ণু দে

"......'রক্তগোলাপ' একবার পড়েছি, আপনি অন্তরঙ্গ মেজাজে কবিতা লিখছেন। আশ্চর্য লাগলো তাই। গুঞ্জনের সুর ভালো লাগল। এরপরে আপনার কবিতা নতুন এক সমন্বিত রূপ পাবে. তাই আপনার স্বাস্থ্য আমাদের কামনার বিষয়। কারণ শুধুই যাঁরা গুনগুন ক'রে গান করেন, তাঁদের কাব্য ক্ষীণপ্রাণ হয়; প্রবল উচ্চস্বর কাব্যে যাঁর ভয় নেই, তিনিও যখন অন্তরঙ্গ আলাপের কবিতায় ডুব দেন, তখন সে মর্মর ধ্বনি অন্যভাবে সার্থকতার সূচনা করে।......আমি অবশ্য আপনার কবিতা—বিশেষত 'উদাত্ত ভারত' বিষয়ে প্রায়ই যে-কথা তর্কে বলেছি তাই বলব, এলিয়টের সেই three Voices of Poetry-র কথা। আপনি উচ্চস্বর কবিতা লিখতেন ব'লে অনেকে আপত্তি করত, আমি করি নি। উচ্চস্বর কবিতাও কবিতা এবং আপনার অনেক কবিতা নিজগুণে আমাকে খুশি করেছে। তাই আপনার কাব্যের সাম্প্রতিক মুখোমুখি স্বর, আপনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে আরেক গভীরতার দিকে।"

—পত্রাংশ : ২৮-৯-৫৮

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"...'রক্তগোলাপ' সংকলনটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। স্বাস্থ্যভঙ্গের গ্লানিকে অতিক্রম করে আপনার অক্লান্ত লেখনী বাংলা কবিতাকে নব নব উন্মেষে মণ্ডিত করে চলেছে। আপনার রচনার উৎকর্ষ যে সর্বজনস্বীকৃত, তার অত্যন্ত সঙ্গত সাহিত্যিক কারণ রয়েছে।"

—পত্রাংশ : নিউ দিল্লী : ২৫-৯-১৯৫৮

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের আধুনিকতম কবিতার বই 'রক্ত-গোলাপ' মনোযোগ দিয়ে পড়লে, বাঙালী পাঠক খুসীর সঙ্গেই একটি আবিষ্কৃতির আনন্দ লাভ করবেন। এতদিন যিনি বহু বিচিত্র ছন্দকেই প্রধান বাহন করেছিলেন তাঁর কাব্যসরস্বতীকে এই বইয়ে তিনি সাজিয়েছেন গদ্য কবিতার মালা এবং এ সজ্জা একই সঙ্গে যেমন অভিনব, তেমনি প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ১৯৩৫-৩৬-এ রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্য ছেড়ে গদ্যকে কাব্যরচনার মাধ্যম করেন, তখন এই প্রসঙ্গে

তিনি বলেন যে, ছন্দের যে বিশেষ সুর-সংগীতিতে আমরা অভ্যস্ত, গদ্যে সে ধরনের সংগীত হয়ত নেই। কিন্তু গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, যা প্রকৃত শিল্পীর হাতে তৈরী হয় এবং প্রকৃত সুরজ্ঞের কানে ধরা পড়ে।

একথা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। বরং এটাই বিংশ শতকের বহু বিজ্ঞ সমালোচক বলেছেন যে মিলের খাতিরে, অলংকরণের মোহে পদ্যে অধিকাংশ সময় এমন অনেক শব্দ যোজনা করতে হয়, যার প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল না। এমন অনেক সর্বনাম ও নামধাতু লাগানো হয়, যা কস্মিনকালেও প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে আসে না। কাজেই পদ্যের মাধ্যমে অকপটে নিজেকে প্রকাশ করা কঠিন। যে কোন রকম আন্তরিক প্রকাশও কিছুটা কৃত্রিম, কিছুটা ভারাক্রান্ত হতে বাধ্য। গদ্যে এই সব হাংগামা নেই, তাই সুরেলা ও সুসম্বন্ধ গদ্যই হল আধুনিক কবিতার প্রকৃষ্টতম মাধ্যম। হুইটম্যানের Leaves of Grass এবং তুর্গেনিভের Poems in Prose থেকে এই আন্দোলনের সূচনা কাল ধরা হয়। কিন্তু আমাদের শ্রুতি ও উপনিষদের স্তোত্র থেকে মধ্যযুগে অনূদিত ইংরেজী বাইবেলের শ্লোকগুলি পর্যন্ত, বহুকাল ধরেই গদ্য-পদ্যের মাধ্যমতা করেছে।

এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, শ্যামলী, পত্রপুট, পুনশ্চ ও শেষ সপ্তক, এই চারখানি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে গদ্য কবিতা লেখা সুরু করলেও, লিপিকাতেই তিনি গদ্য কবিতার পরীক্ষা সুরু করেছিলেন প্রথম, যদিও এই বইয়ে রচনার চরণগুলিকে পদ্যের মতো সাজিয়ে উপস্থিত করেন নি তিনি। ১৯৩৫-৩৬ থেকে রবীন্দ্রানুগামী আধুনিক কবিরাও গদ্য কবিতা লেখা সুরু করেন। বাংলা কবিতার এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য সম্পদ দিয়েছেন তাঁরাও কম নয়। বলে রাখা দরকার যে, এই কবিদের দলে বিমলচন্দ্র ঘোষ শুধু একজন নন, অনেক দিক থেকে তিনি প্রধান একজন। 'সোহিনী', 'হিন্দোল' দুই পর্যায়ে বিভক্ত বর্তমান সংগ্রহের কবিতাগুলি গদ্য কবিতা বটে, কিন্তু সবই আগে কবিতা, তারপর গদ্য। নিখুঁত তালমাত্রা ও মুদ্রা বজায় রেখে নাচছে যে নর্তকী, ইচ্ছে করেই যেন কবি তার পায়ের নূপুর ছড়া দুটি খুলে নিয়েছেন! তাই কান তাতে হয়ত বঞ্চিত হচ্ছে কিছুটা, কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে না বলেই, দৃষ্টি ও রসাস্বাদ করার সুযোগ পাচ্ছে আরো বেশী ক'রে।

এ কথা আজকের দিনে আর গোপন নেই যে, গদ্যেও কবিতা হয় বলে অধিকারী-অনধিকারীর ভেদ সহজেই মুছে গেছে আজ কবিতার রাজ্যে। আসলে নিরলংকৃত সহজরূপে মনোহরণ করা যে ঢের বেশী শক্ত, এ মনে রাখেন নি অনেক লেখক। সেই জন্যেই বহু জঞ্জাল ও আগাছার আবাদ হয়েছে সাহিত্যে গদ্য কবিতার নামে। অবশ্য হয়েছে তা অন্য দেশেও। এমন দিনে 'রক্ত-গোলাপ'-এর মতো সার্থক কবিতাগ্রন্থ পড়ে শুধু মন ভরলো না, অনুভূতির তারগুলিতেও কম্পন লাগলো। 'ভৈরবী', 'অনন্যা', 'মেঘমল্লার', 'নিরাসক্তি', চুপ করে বসে থাকা', 'ফাঁসি', 'শেকড়', যে কোন কবিতা হাতে নিন, প্রত্যেকটাই দ্যুতি ও পূর্ণতায় নিটোল এক-একটি মুক্তোর মতন। জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে বিমলচন্দ্র ঘোষ কোনদিন নৈরাশ্যবাদী নন, এ বইয়েও ধ্বনিত হয়েছে তাঁর দুঃখোত্তীর্ণ মৃত্যুঞ্জয় পৌরুষের একটি দীপ্ত সুর। তবে জ্বলজ্বলে দুপুরের সংগেই যেন একটু ছলছলে বিকালেরও ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে কি প্রৌঢ়তার প্রতিভা? কবিকুঞ্জের এই পরিণত ফসলগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি।

—রবিবারের যুগান্তর : ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৮

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।* বিমলচন্দ্রের কাব্যে একটি আদর্শের প্রতি স্থির বিশ্বাস, উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের বক্তব্যকে প্রতিফলিত করেছে। তিনি মানুষের কবি। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাই এই কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে উৎসারিত। সমস্ত সংশয়ের ঊর্ধ্বে অবিচল আলোকশিখার মতো এই কবিতাগুলি শাশ্বত মানবাত্মার বাণীকে প্রতিধ্বনিত করেছে। মহান ভারতের জয়গান যেমন তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত, তেমনি অকুতোভয় প্রাণে তিনি প্রণতি জানিয়েছেন কার্ল মার্ক্সকে :

"হে মহান অগ্নি-পদ্ম! প্রেম-পদ্ম! লাঞ্ছিত আত্মার
চৈতন্য-প্রতীক তুমি তোমায় অযুত নমস্কার!"

অনুরূপ আবেগদীপ্ত ভাষায় তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লেনিন, স্তালিন আর এঙ্গেলসকে। তাঁর বিশ্বাসই এই কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র দীপ্তি দিয়েছে। তিনি অনাগতকালের মানুষের আগমনী গেয়েছেন, 'উত্তরাধিকারীরা আসে' কবিতায়। গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'অনিরুদ্ধ' কবির অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত। বন্দী প্রমিথিয়ুসের মতো তিনি উজ্জ্বল বিশ্বাসের প্রেরণায় বলেছেন : 'বন্ধন মানি নি আজো মুক্তপক্ষ মুক্তির উল্লাস'। মুক্তপ্রাণ মানবাত্মার কবি বিমলচন্দ্রকে আমরা স্বাগত জানাই। তাঁর কাব্যসত্য জীবনসত্যে রূপায়িত হয়ে মানুষের বেদনা দূর করুক।

—রবিবারের যুগান্তর : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

* ১২ই ডিসেম্বর : প্রকাশক : "ট্রেড ইউনিয়ন" পত্রিকা।

প্রেমনিষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র

সুনীলকুমার দাশগুপ্ত

'কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে :

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ॥'

সাহিত্যের তথ্য ও সত্যের বিচারপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সমালোচক-দের উদ্দেশ্যে এইভাবে কটাক্ষপাত করেছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে বিমলচন্দ্র ঘোষের অনুক্ত মানসিক অনুযোগটাও বোধহয় এইরকমই। তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গে আলোচনা খুব বেশি না হলেও হয়েছে এবং তা একদেশদর্শী, —মূলতঃ তাঁর তথ্যনিষ্ঠার প্রাকরণিক মহিমার ওপরই। অর্থাৎ তাঁর কলা-কৃতিত্বের মূল্যায়ন হয়েছে সমাজবিপ্লবী ধারণার সীমানায়। যেখানে তিনি শুধু-

মাত্র সংগ্রামী কবি, সাময়িক সিদ্ধির রূপকার। কারুর কারুর মতে হয়তো তিনি শুধুমাত্র Topical poet, নগদ মূল্যেই যাঁর আত্মতুষ্টি। একথা ঠিক বিষয়বৈচিত্র্য কবি বিমলচন্দ্রের কাব্যসিদ্ধির প্রাথমিক স্তর। কবিমননের অনন্য বস্তুনিষ্ঠা এবং ভূমিচারী রোম্যান্টিক অভীপ্সা তাঁর প্রকরণগত ব্যাপকতায় অংশত আচ্ছন্ন। তার কারণ, সতের বছরের কেরাণী-জীবনের অন্তর্জ্বালা এবং সমাজসৃষ্ট দুঃসহ দারিদ্র্যের অভিশাপ তাঁর কবি কল্পনাকে পরাজিত করতে পারে নি ঠিক, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সিংহদ্বারে কড়া প্রহরী মোতায়েন রেখেছে। যার ফলে রসিক-মহলে তাঁর প্রাণস্পর্শী অভিজ্ঞানপত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

কবির প্রাণৈষণার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অসংখ্য প্রেমের কবিতা। বিস্ময়ের কথা, কবি বিমলচন্দ্রের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমধর্মী এবং প্রেমের পরোক্ষ পটভূমি। যে কোনো কবিকে এই অপরূপ লাবণ্যব্যঞ্জনাময় প্রেমসংহিতাগুলি প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে সগৌরবে আসন দিতে পারতো। অথচ কবির খ্যাতিলাভ ঘটেছে তাঁর সমাজবিপ্লবমূলক 'চরৈবেতি'—অভীমন্ত্র-স্বাক্ষরিত কবিতারই কল্যাণে। রসিক-মহলের অপবাদ দিচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্যের বৈষম্য সম্পর্কে যে সঙ্গত মৌল প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন, আজ রবীন্দ্রোত্তর যুগের খেয়ায় অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেও মনে হয় আমরা সে সম্পর্কে খুব বেশি সতর্ক বা সচেতন হতে পারি নি। আজকের যুগচিন্তার উচ্চগ্রামে আমরা সাহিত্য-পঠন এবং সমালোচনা সম্পর্কে অতি সাবধানী হতে শিখেছি এবং এক-একজন কবিকে তাঁর সাময়িক চাহিদার তুলাদণ্ডে ওজন করে মূল্য-নির্ধারণ কচ্ছি এবং কবিনামা পরিয়ে দিচ্ছি। অথচ রসিক-মহলের একথা কখনোই অজ্ঞাত নয়, যে, বিশ্বপ্রেমের ব্যাপকানুভূতির প্রচারণা খুব উঁচুদরের বস্তু হলেও, যে-কবির জীবনে বা মননে একটি কান্তাস্পর্শী অনুভূতি কখনো আসে নি, তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত, গবেষক, বৈজ্ঞানিক সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু কবি বা জীবনশিল্পী হতে পারেন না।

অথচ বিমলচন্দ্র জাতকবি এবং এই কারণেই প্রেমিক,—সমাজবিপ্লবী বিশ্ব-প্রেমিক হতে পেরেছেন, সর্বাগ্রে তিনি কান্তাপ্রেমিক ব'লে। সুচিস্মিতার মধু-স্বাদী অধরমঞ্জুষার সুস্থ-সচেতন প্রত্যাশী তিনি, অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-সাধনার সোচ্চার যন্ত্রণায় পঞ্চাশ-প্রান্তেও তাই তাঁর কণ্ঠে শুনি :

"...তুমি এসে ফিরে গেছ বার বার নটিনী হাওয়ার
লগ্নে রাতের সোনালী চাঁদের জাগর জ্যোৎস্না
ব্যর্থ। মাথায় শ্বেতকেতু ক্রুর কালের নিশান
অপমানে প্রেম মরে গেছে প্রেম হতাশার প্রেম!

ঝড় তো থামে না, কবে থামবে? তাই স্থবিরের
চেতনা বিরাম চায় নি। চাঁদের অপঘাতে নীল
ওষ্ঠে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। পাণ্ডুর বন
ফুলেরা সজাগ সুরভি সজাগ মৃত্যু সজাগ।"

[—শারদীয়া পরিচয় : আশ্বিন ১৩৬৬]

বিমলচন্দ্র সজাগ সচেতন শিল্পী, সংগ্রামী জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে তিনি যেসব সাময়িক কাব্যের অরিন্দম প্রহরণ প্রয়োগ করেছেন তাদের আয়ুষ্কাল

সম্বন্ধে তিনি নিজেও পণ্ডিতদের মতোই সংশয়ী। তাঁর বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি তাঁর অজস্র সার্থক প্রেমের কবিতার ওপরই সংস্থাপিত। এখানে তিনি কালজয়ী বাসনায় ভবভূতির 'উত্তর-সাধক'।

'অনন্ত শৃঙ্গার-স্বপ্নে যাযাবর রাজহংস ডাকে
রাত্রির আকাশ চিরে,
অনুষঙ্গে সুন্দরিকা রয়ে গেলে অনাঙ্গিকা শ্রীমতী আমার
হ্লাদিনীহৃদয় ভ'রে দিয়েছ আমায় শুধু বৈষ্ণব বাসনা
অনুপমা তমঃশ্যামা স্বাতী নিরঞ্জনা,
তুমি মোর জ্যোতিশ্চক্রে নক্ষত্ররূপিণী বিষাদিনী।'

[—পাণ্ডুলিপি : ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৭]

১৯৫৯ সালেও শুনি সেই Quest Eternal—

'শোনাও গান জাগাও প্রাণ নির্নিমেষ আঁখি
তোমার মন আকাশ আজ আমার মন পাখি।'

বিমলচন্দ্রের চিত্রার্পিত চেতনার অননুকরণীয় সুর-ঝঙ্কার শুনি সংশয়ী প্রশ্নের সুললিত সিদ্ধান্তে :

'ভোরে বুলবুল শীষ্ দেয় নীল অপরাজিতায়
স্বর্ণচাঁপায়
কোকিল—অশোক, কৃষ্ণচূড়ায়।
'চোখ গেল' পাখি ভুল ঠিকানায়
বেদনা জানায়
রাত জাগে, দিনের রোদের জ্বালায়।

আকাশ কাঁপায়
'পিউ পিয়া'-সুর রাত্রি দুপুর
বাজে পল্লবে আলোর নূপুর
চাঁদের কপালে রাঙা চন্দনে জ্বলে মাণিক।
তোমার কবিতা হ'ল না শেখা
কাঁপে চৈতালি পত্রলেখা
মন কি বিশ্ববেদনাজয়ের বৈতালিক?'

[—শারদীয় আন্তর্জাতিক : ১৯৫৭]

যাঁরা 'তুমি-আমি'র হাজারবর্ষব্যাপী একঘেয়েমীর সুরে বীতরাগ এবং অন্যতর সুরের প্রত্যাশী, তাঁরাও কর্মক্লান্ত দিনের চিতায় মধুবসন্তের পুষ্প-রেণুস্নিগ্ধ শান্তিজলের অভিলাষী এবং 'তুমি ও আমি'র উন্মোচনী কামনায় উন্মুখ। প্রেমের সে বিশ্বজয়ী মহিমার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, তাঁদের কাব্য-রসাস্বাদন বৃথা। কেননা পৃথিবীর আদি কাব্য থেকে শুরু ক'রে অনন্তকালের কাব্যস্রোতে প্রেমই প্রাণদায়িকা শক্তি। তাই ব্যাধিজর্জর অকালবার্ধক্যপীড়িত বিমলচন্দ্রের মুখে শুনি :

'তুমি আমার হৃদয়ের যৌবনকে অভিনন্দিত করেছ
চোখে পড়েনি বাইরের জরা।

কালজয়ী কোকিলের ডাকে
রাত্রিজয়ী জ্যোৎস্নায়
মুকুলের ঘুম ভাঙানো বসন্ত বাতাসে
তাই আমার বেঁচে থাকার সাধ এত নিবিড়।'

[—পুনর্জন্ম : রক্তগোলাপ—২০ পৃঃ]

শোপেনহাওয়ার তাঁর 'Metaphysics of love'-এ এই প্রেমেরই সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কথা আলোচনা করেছেন। হোমার থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত এই প্রেমসাধনা আর শিল্পসাধনার অভিন্নত্ব প্রকাশ পেয়ে আসছে। সভ্যতার উষালগ্নের রক্তোচ্ছ্বাস দিয়ে গড়া এই মানুষী প্রেমের রঙ চিরঞ্জীব। কেননা মানুষ বাঁচতে চায় শুধু খেয়ে-পরে নয়, প্রিয়-মিলনের পথে নিষ্কণ্টক এবং নিশ্চিন্ত হয়ে। শ্রেণীদ্বন্দ্বময় সমাজে পদে পদে প্রেম-সাধনায় বাধা আছে ব'লেই প্রেমিক কবি বিমলচন্দ্রের বিপ্লব-সাধনা।

মানুষের সর্বানুভূতির স্বমহিম সম্রাট এই প্রেম, তাই হেলেনের রূপমদিরা-মত্ত ভালবাসা ট্রয় নগরীর ধ্বংস-সাধন করেছিল। বিশ্বাসঘাতিনী ক্লিওপেট্রার প্রেমের আগুন ক্ষুরধারবুদ্ধি–এ্যান্টনীকে পুড়িয়ে মেরেছিল। সন্দেহকুটিল Cupid-এর নিষ্ঠুর পরিহাসেই ওথেলো-ডেসডিমোনার চরম ট্র্যাজেডী। গ্যেটের শয়তানের ক্রিয়াকলাপ এই প্রেমেরই তির্যক কামনায় ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। শেলীর কল্পনা বিরহজনিত তীব্র যন্ত্রণায় আকাশচারী সুদূরতায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল। কীট্সের রূপারতিও ব্যর্থ প্রেমের 'aching joy'-এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের কাব্যও নরনারীর রতিসম্ভোগজনিত অতৃপ্তি এবং কল্যাণকামী মিলন-সাধনায় অভিষিক্ত। বিশ্বপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ প্রেমেরই একছত্র সম্রাট—তাঁর প্রেমতৃষ্ণা দূরযানী অধ্যাত্ম-অভিলাষী মানসকল্পনারই বিশ্বস্ত সহচর। বিপ্লবী প্রেমিক বিমলচন্দ্রের কুড়ি বছর বয়সের কণ্ঠস্বরে শুনি :

'প্রেম! প্রেম! আহা প্রেম যে কি?
দুনিয়াটা মিছে প্রেমছাড়া,
হে প্রবীণ তুমি বুঝবে কি
প্রেমের ডাকাতী ঘুম-কাড়া!
নীতির শুচিতা নরকে যাক
ঠোঁটে ঠোঁট বুকে বুক রাখা
ফাগুনের আমি শুনেছি ডাক
কপালে সোনালী চাঁদ আঁকা।'

[—প্রেম : উদাত্ত ভারত—পৃঃ ৭৮]

কেননা কবি জানেন :

''Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.'

বাইশ বছর বয়সে নিষিদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণায় তাঁর সুদুর্লভা নায়িকার উদ্দেশে বলছেন :

'উদয়ের পথে উল্কাচক্ষু মেলিয়া তপন কাঁদে
রশ্মিতে শত স্বর্ণ-ভ্রমর তোমারি রাগিনী সাধে।'

[—ক্রন্দসী : উদাত্ত ভারত—পৃঃ ৮৮]

তার কারণ—

> 'মন আর মনোরথ এ দুয়ের মাঝখানে জমাট পাথর
> বাটালিতে কুঁদে কুঁদে কারুশিল্পময়ী কত অজন্তা ইলোরা উজ্জয়িনী
> রচনা করেছি শত শতাব্দীর অনুরাগে ভরা,
> তুমি শুধু সে পাথরে দিলে নাকো ধরা।
> প্রেম আর রক্ত আর অশ্রু দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে সে পাথরে রঙ
> ধরাতে পারিনি আজো শুক্তিস্বচ্ছ লাবণ্য শিখায়।
> তুমি আজো রয়ে গেলে আদিম সূর্যের স্বপ্নে ভৈরবী চেতনা,
> তোমার সামীপ্য ছাড়া তবু এ জীবন তা'র আকাঙ্ক্ষার
> আস্বাদ পেত না।'

[—শিলালিপি : উদাত্ত ভারত—পৃঃ ৬৭]

বিমলচন্দ্র নিঃসন্দেহেই একজন সমাজবাদী কবি। সমাজবিবর্তনের ধারা অনুসারে সাহিত্যেরও বিবর্তন ঘটে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্যও যুগান্তকারী হয়েছে—তা'র নিদর্শনও দুর্লভ নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের আবির্ভাব কোনো একটি বিশেষ সৃজনী-প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়,—রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনের বিপর্যয় ও বিভ্রান্তিই এ যুগের ভাগ্য-নিয়ন্তা। মধুসূদনের বৈপ্লবিক আবির্ভাবের পর রবীন্দ্রনাথ পূর্ণসিদ্ধির ভাষ্যকার। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার বাঁক অনেকগুলি এবং তা রূপ ও রসের বৈচিত্র্যে এতই অসাধারণ, যে, মঙ্গল-কাব্য ও পদাবলীর পাঠকের পক্ষে তা'র আনন্দের শিহরণ সহ্য করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর্বে—বাঙালীর সশস্ত্র বিপ্লব-সাধনার ব্যর্থতার পর, নতুন ক'রে চলছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের চরম প্রস্তুতি। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসে দেশে তখন ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়ে গিয়েছিল। যুগের হাওয়া বদলাচ্ছিল দ্রুতলয়ে। সমাজসমস্যা জটিল হয়ে উঠেছিল নানা দিক থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনেরও এটা চরম সংকটকাল। বেকার সমস্যার বীভৎস রূপ—মধ্যবিত্ত-জীবনের চরম অবমাননা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আত্মিক সর্বক্ষেত্রেই একটা দুঃসহ সংকট-লগ্ন দেখা দিয়েছিল।

এ যুগের নবীন কবিদের (যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্তসন্তান) পক্ষে সম্ভব ছিল না একে অস্বীকার করবার, আবার সম্ভব ছিল না রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণ করবার। অসুন্দরকে সুন্দররূপে কল্পনা করবার এবং তাতে তৃপ্ত হবার মতো ধৈর্য এবং সুগভীর প্রত্যয় এ'দের ছিল না। যুগচরিত্রের অনিবার্য প্রভাবে এ'রাও তাই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়েই পাশ্চাত্য দেশে নেতিবাচক বিপ্লবী কবি Eliot-এর কবিতার প্রভাব এ দেশে তরুণ কবিচিত্তে নতুন আস্বাদের ইঙ্গিত এনে দিয়েছিল,—তা ছাড়া ইতিপূর্বেই আমেরিকার কবি হুইটম্যানের 'body- electric'-এর উন্দামতা, ফ্রয়েডের Oedipus Complex-এর বিকৃত প্রচার, জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদী জীবনদর্শন এবং নবযুগস্রষ্টা কার্ল মার্ক্সের কালজয়ী প্রভাবের ভাসা-ভাসা ধারণা ইত্যাদি অসংখ্য ভাব ও ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত ছিল এ যুগের তরুণ কবিদের মানসচিন্তা। ঠিক এই সময়েই কল্লোলের আবির্ভাব; বিচ্ছিন্ন কবিদের মিলনক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়াল এই পত্রিকাটি। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি নতুন কবিদের নতুনতর কাব্যসাধনার

পালা শুরু হ'ল। শুরু হ'ল প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমার-জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দের বিচিত্রমুখী কাব্য-সাধনা।

এরই এক প্রত্যন্তসীমায় প্রায় একক সাধনায় আস্থাশীল, অমিত আত্ম-নির্ভরতায় বিশ্বাসী অরাও একটি শক্তিমান কবিপ্রতিভার মালঞ্চে প্রদীপ জ্বললো, তিনিই একালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "জীবন ও রাত্রি"র দৃষ্টিকোণ সমাজ-কৌলিন্যের উচ্চ মঞ্চ থেকে নেওয়া হয় নি, সাধারণ জীবন-পিয়াসার অতৃপ্ত বাসনারই কাব্যায়নে তা'র সার্থকতা। এবং এরই অন্তর্ভুক্ত 'কুয়াশা', 'কৃষ্ণগোলাপ', 'সন্ধ্যাকাশের তারা', 'ঘুমাও ঘুমাও', 'পৃথিবীকে ভালবাসি', 'সুপ্তি ও মৃত্যু', 'অমানিশার প্রেম' প্রভৃতি কবিতাগুলি একজন কুড়ি-একুশ বছরের কবির অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষরে দীপ্যমান। কবিতাগুলি তৎকালীন রসিকসমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

'শুভ্রাংশুর পাংশু আঁখিতে দুঃসহ ব্যথা ঘনায়ে আসে
হে উদাসিনি!
মৃতপুষ্পের মাল্য গাঁথি'
এলোচুলে কেন জড়ায়েছ সখি, আসেনি তো আজো বিদায় রাতি!'

[—কুয়াশা : জীবন ও রাত্রি]

লক্ষ্য করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কবির প্রেম-সাধনার প্রাথমিক পদ-ক্ষেপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশমান। কবির আকৈশোর সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার ফলে ভাষার ওপর তাঁর প্রথম থেকেই অসাধারণ দখল ছিল।

'ঐহিক প্রেমের তৃষা যে আলোয় উঠেছিল জাগি
সোনালি পদ্মের আলো তোমার নয়ন সরোবরে
যৌবন যাত্রায় মোর; সারারাত্রি আজো তারি লাগি
নিরর্থক বেঁচে-থাকা অসহ্য ব্যথায় কেঁদে মরে।
অপরাধী নহি তবু হে পৃথিবী ক্ষমাভিক্ষা মাগি,
শরশয্যা 'পরে একা রজনীর অন্ধকার ঘরে
কেড়ে লও সুপ্তি মোর বিশ্রামের নহি অনুরাগী
পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় আজি আহত চাঁদের রক্ত ঝরে,
মিথ্যা কাঁপে স্বর্ণছায়া পূর্ণিমার বর্ণমায়া অতৃপ্ত এ আত্মা কেঁদে মরে!'

[—সুপ্তি ও মৃত্যু : জীবন ও রাত্রি]

এই বাস্তব যন্ত্রণাজয়ের সাধনাতেই বিমলচন্দ্র আজ বিপ্লবী। "কৃষ্ণগোলাপ" কবিতাটির প্রকাশধর্মিতায় অসাধারণত্ব প্রকাশ না পেলেও ভাবানুষঙ্গ বিচারে কবিতাটি সত্যিই মৌলিক। "কৃষ্ণগোলাপ" নামটিও খুব ব্যঞ্জনাধর্মী। গোলাপ তার স্বীয় অনুরাগের রঙেই নামাঙ্কিত হবার যোগ্য। তার অপূর্ব সুরভি-মাধুর্যের ওপর সমাজ-কলঙ্কের কৃষ্ণছায়া পাঠকমনকে ক্ষুব্ধ-জিজ্ঞাসায় আর্ত ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথ কুরূপা নারীর মর্মবেদনার কথা উদ্ঘাটন করেছেন "গুপ্তপ্রেম" কবিতাটিতে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র একটি অতি বাস্তব সামাজিক সত্যকে তুলে ধরেছেন এখানে। শুধু রং-ই কালো নয়, অনাহার বা

অর্ধাশনজনিত অত্যাচারে দেহও ক্ষীণ। এইটিই সমাজবাদী কবির স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর।

'কালো রঙ্ ক্ষীণ দেহ রূপহীনা বলিতেও পারো
অন্তর্গূঢ় বেদনার ম্লানছায়া কোমল অধরে
নয়নে শীতাংশু দীপ্তি অপমানে ক্ষুব্ধ অশ্রু ঝরে
কুৎসিতা শ্রীহীনা ব'লে হয়তো বা চোখে লাগে আরো।'

[—কৃষ্ণগোলাপ : জীবন ও রাত্রি]

কুড়ি-একুশ বছর বয়সে কবির মনের বৃন্তে ফুটেছিল এই "কৃষ্ণগোলাপ", যাকে উদ্দেশ ক'রে কবি সাতাশ বছর বয়সে লিখেছেন :

'ছ' বছব আগেকার একটি কথা
হঠাৎ পড়লো মনে তোমায় দেখে!
যদি বলি, 'এতকাল ভুলিনি তোমায়!'
হৃদয়াবেগের কথা মিথ্যা শোনায়;
দিন যাবে না পাওয়ার কাব্য লিখে
এতখানি বিলাসের সময় কোথা?'

*   *   *

'ময়নাপাড়ার মাঠে দেখিনি তোমায়
নও তুমি কল্পিতা কৃষ্ণকলি
অঙ্গে তোমার ঘনমেঘের মায়া
বৈশাখী ঝড় ওঠে ব্যঙ্গ হেসে
কৃষ্ণা, তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশে
তাই তো তোমার নামে কবিতা লিখি!'

[—কৃষ্ণা : সওগাত—১৩৪৩]

কুৎসিতা-কুরূপা 'কৃষ্ণগোলাপ' আর কবির জীবনে উপেক্ষিতা নির্যাতীতা নয়—ছ'বছর পরে কবি দেখেছেন তাকে বিপ্লবী-নায়িকারূপে। তাই প্রেমের আবেশে নয়, কবি তার কৃষ্ণকেশের ছন্দে ঝড়ের স্বরলিপি রচনা করেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী বিমলচন্দ্রের নিজস্ব।

কবির সামাজিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার এবং চেতনার আর একটি উদাহরণ তাঁর "অমানিশার প্রেম" কবিতাটি। একটি কিশোরীর বৈধব্যের মর্মান্তিক হাহাকারে অভিষিক্ত এই কবিতাটি সত্যিই একটি প্রচন্ড ক্ষোভে পাঠকের মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে।

গোড়াতেই বলেছি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্য-সাধনায় পাঠক সাধারণ নিয়মিত রসানুকূল্য থেকে বঞ্চিত। তার কারণ কবি লিখেছেন অজস্র,—প্রকাশ করতে পেরেছেন সামান্য। এই কারণে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীর কালানুক্রমিক ধারা অনুসরণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। মানস-প্রকৃতির ধারা অনুসরণে এই ঐতিহাসিক মানসবিবর্তনের পর্বসন্ধিগুলি অবশ্য আলোচ্য। কিন্তু সময়সীমার বিরূপতায় সেই দুঃসাধ্য প্রয়াস আপাতত স্থগিত রেখে তাঁর প্রেমকাব্যের এবং মোটামুটি তাঁর প্রেমপ্রকৃতির একটা সামগ্রিক চেহারা তুলে ধরবার চেষ্টা করাই বিধেয়।

ব্যক্তির অভিমানী সত্তার প্রত্যাখ্যান নয়; সমাজ-অনুশাসনের কঠোরতা কবির নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে অন্তরায়। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ বহুবল্লভ

প্রেমে বীতরাগ, শাস্ত্রানুশাসিত আপসের বিরোধী ও আত্মমর্যাদাশীল পারস্পরিক বলিষ্ঠ হৃদয়-বিনিময়ের উপাসক। কবির নায়িকাও তাই :

'আপন ভাগ্য জয় ক'রে তুমি আসবে
ভালো যদি লাগে স্বেচ্ছায় ভালবাসবে
প্রবল প্রাণের সম্ভ্রমবোধে
হবে না স্বেচ্ছাচারিণী,
অন্ধকারের বুক-চেরা বাঁশী বাজানো
সুরের শিখায় সারি সারি দীপ সাজানো
অমাজয়ী রাঙা যুগাবর্তের
তুমি হবে মনোহারিণী।'

[—জয়মতী : উদাত্ত ভারত—১০৮ পৃ']

প্রকৃতপক্ষে নারীচরিত্রের কুটিল ছলনাময়ী রূপ কবিকল্পনায় অস্পৃশ্য। তাইতো মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিপ্লবী ধারণায় কবি পাশ্চাত্য-অনুগামী হ'লেও প্রেমাদর্শে চিরন্তন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই বিশ্বস্ত অনুচর। কবি তাই কখনোই বলতে পারেন না 'Her sins are gorgiven her because she loved much'. কেননা কবির নায়িকা সে পাপ-পুণ্যের বহু ঊর্ধ্বে। সেই সংকট-প্রশ্নের জবাব নেবার দায়িত্ব থেকেও তাই কবি বিমলচন্দ্র মুক্ত।

বিমলচন্দ্রের প্রেমের কবিতাগুলির উৎসরূপা নায়িকা এক রহস্যময়ী নারী। কয়েকটি কবিতার মধ্যে দিয়ে যতটুকু বুঝেছি তা'তে মনে হয়, এই নায়িকার সুদীর্ঘ সাহচর্য একদা কবির সমস্ত মন-প্রাণ ভরিয়ে রেখেছিল। তাঁদের সামাজিক মিলনের পথে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কোনো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সেই রহস্যময়ী নায়িকা জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ নারীত্ব থেকে বঞ্চিত হ'য়ে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' ফুটে রইলেন চিরনিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার দুর্বিষহ অন্ধকারে। "অমানিশার প্রেম", "সুপ্তি ও মৃত্যু", "সন্ধ্যাকালের তারা" প্রভৃতি কবিতায় এই চরম ট্র্যাজিডীই ফুটে উঠেছে। তারপর সেই রহস্যময়ীর সঙ্গে তাঁদের রোমান্টিক ভাব-বিনিময় হয়েছে দিনের পর দিন। মধুস্বাদী বসন্তের আর্ত-বিহ্বল বাতাস প্রিয়াসান্নিধ্যেও কবিচিত্তে আলোড়ন এনেছে। প্রেম-জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে কবিকে বৈরাগ্যধর্মে অনুপ্রাণিত করেছে। 'মরুজ্যোৎস্না' কবিতাটিতে এই যন্ত্রণাবিধুর মন রূপায়িত। সেই দুসহ অভিশপ্ত অবস্থা প্রেয়সীকে করেছে প্রতিমা, প্রেমিককে পূজারী। কিন্তু সে মিলনে তো সুখ নেই—কারুরই নেই কারণ—

(১) 'তোমার হাতে আমার হাত
তবু আমরা পরস্পরের কাছে নিঃসঙ্গ!'

(২) তুমিও নির্বাক
(৩) আমাদের দুর্লঙ্ঘ ব্যবধানের সুনিবিড় সান্নিধ্যে।'

তাই—

(৪) 'তোমাকে পেয়ে কি হবে?'

(৫) তবু তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না!

[—রক্তগোলাপ]

এতো সেই চণ্ডীদাসের চিরন্তনী কান্নার আওয়াজ—'দুঁহু লাগি দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' একই অনুভূতি, অথচ কয়েক শতাব্দীর পেছনের কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণমুখী উর্ধ্বায়ন, এ যুগের সমাজচিন্তাশীল কবি বিমলচন্দ্রের মানসভঙ্গিমায় কতখানি মানবমুখী রসায়নে উত্তীর্ণ! কবির সেই বঞ্চিত ভাগ্যাহত নায়িকা একদিন চরম জ্বালার অবসান ঘটাতে জীবন বিসর্জন দিল। সেই থেকে কবি বিরহী। আর তাঁর বস্তুনিষ্ঠ জীবন-প্রেম সেই বৈদেহী নায়িকার অশরীরী প্রেমেরই উত্তরভাষণ এবং কবির কাব্যপ্রেরণার উৎসস্থল। 'What poetry is the fruit of her passions!' কবির সমাজবাদী প্রেম তাই কোনো চরিত্র-বিশ্লেষণী প্রবণতায় উৎসুক নয়, সমাজ-বিশ্লেষণী মনস্বিতায় তাঁর প্রিয়ার বঞ্চনার হাহাকারকে তুলে ধরবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যে বাণীময়। তাই Browning-এর Last ride together-এর ব্যর্থপ্রেমে ক্লিষ্ট প্রেমিকের মতো বিমলচন্দ্র প্রিয়া-সান্নিধ্যের শেষ মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কেননা তাঁর কাব্য-নায়িকার ছায়াসঞ্চারিণী স্পর্শানুভূতি কবির মনোলোকেই চিরন্তনী। শেলীর মতোই কবির বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর চতুর্দিকে নায়িকার অসহ্য অশরীরী প্রেম ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু কবির নায়িকার প্রেমৈশ্বর্য কত গভীর!

'...তুমি দিগন্তহীন অনন্ত
আমি তোমার তরঙ্গিত সুর-সঞ্চার!
তোমার সুখ নেই,
আমিও নই সুখী!
তোমার শান্তি নেই
আমিও তাই অশান্ত!
কয়েক হাজার সূর্য তোমার ভালবাসার সমুদ্রে
বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়!'

[—পার্বতী-পরমেশ্বর : রক্তগোলাপ—পৃঃ ১৪]

সংসার জীবনে অকপট মাধুর্য ও কল্যাণশ্রীমণ্ডিত মধুর শুচিস্মিতা জীবন-সঙ্গিনীর সাহচর্যই কবিকে নতুন ক'রে অনুপ্রাণিত করেছে। 'তুমি আছ—আমি আছি'র বলিষ্ঠ বাণীর প্রত্যয়-অভিষিক্ত কবির এই প্রেমসিদ্ধি নিঃসন্দেহে আশাবাদের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। "লক্ষ্মী" কবিতাটি কবির সচ্চরিত্র প্রেমেরই প্রতিভাস—

'দুঃখের ঝড়ে যখনি নিভেছে আলো
তারি হাতে রাঙা প্রদীপের শিখা জ্বলেছে
পায়ের পুণ্য ছোঁয়া লেগে কত সেঁউতি হয়েছে সোনা'

'সে যখন চায় কুঁড়ি ফুটে ওঠে
কেঁপে ওঠে কচি পাতা,
শ্যামবনভূমে মাধবী জড়ায় পিয়ালে।'

[—লক্ষ্মী : উদাত্ত ভারত—১৮৪ পৃঃ]

তবুও আটপৌরে প্রেম—দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়া প্রেম 'প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে' কী মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করে! কবির সজাগ অনুভূতি সেদিকেও ক্রিয়াশীল। মধ্যবিত্ত জীবনের দিনগত পাপক্ষয়ের পরিণামে দাম্পত্য-সম্ভোগ অনেকখানি কাজ করেছে। সত্যি বলতে কি, সন্তানলাভ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে একটা চরম পাপের দৃষ্টান্ত হিসাবে যেন গ্রহণ করা হয়। আদম-

ঈভের প্রতি বিধাতার অভিশাপ মনে হয় যে সমগ্র পৃথিবীর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত-সমাজের ওপর বর্তেছে। স্ত্রী যখন সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর, স্বামী তখন জীবিকার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। তবু তারি মধ্যে মধুবসন্ত এসেছে, কোকিল ডেকেছে, মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে আর্থিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। তবু দয়িতার স্বপ্নভঙ্গ হয় নি! এই মধ্যবিত্ত ট্র্যাজিডির অপূর্ব রূপ অত্যন্ত বেদনাস্নিগ্ধ বিদ্রূপদগ্ধ ভাষায় কবি উপস্থাপিত করেছেন—

'আমরা দু'জন যে ক'টি জীবন এনেছি এ সংসারে
কত মধুরাতে মুগ্ধ হৃদয় শাস্ত্রীয় ব্যভিচারে,
পরিণামে তাই সুস্থ জীবন সম্ভব হ'ল নাকো
বৃথা আশা নিয়ে অবাস্তবের নরকেই ডুবে থাকো।'

[—বিগত বসন্ত : উদ্বাস্তু ভারত—১৮৯ পৃঃ]

মধ্যবিত্ত স্বামীর জীবনসঙ্গিনীর সাধ সন্তানের দূরাগত ভবিষ্যৎ-কৃতিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে শ্রেণীদ্বন্দ্বময় সমাজব্যবস্থার কল্যাণে আজ স্বামীর জীবন দুর্দশাপ্রপীড়িত, অবুঝ নারী জানে না তার সাধের সন্তানরাও তার থেকে মুক্তি পাবে না। দারিদ্র্য শুধু যৌবনমাধুরীকেই রাক্ষসের মতো গ্রাস করে নি, দুর্ভাগা সন্তানরাও একফোঁটা দুধের অভাবে কেঁদে মরছে। তবু সন্তানবতী দয়িতার প্রগলভ্‌তা আর অপরিণামদর্শিতার অন্ত নেই। তাই অসহায় প্রেমিক-হৃদয় বোবা কান্নায় গুমরে উঠে সান্ত্বনা দেয় :

'ভুল নয় সখি তোমায় পাবার উদ্দাম কামনায়
প্রেমের উনুনে দেহের কড়ায় আদিরস জ্বলে যায়;
শরীরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধোঁয়াটে গন্ধ তা'র
ভরপুর ক'রে রেখেছে ঘরের ছাঁপোষা অন্ধকার।

মরা কোকিলের ডানার আঁধারে বসন্ত গেছে ডুবে
মরা চাঁদ ওঠে মরা আকাশের সিঁড়ি ভেঙে চুপে চুপে,
তেপান্তরের প্রৌঢ় জ্যোৎস্না ভাঙা লণ্ঠন হাতে
গুঁড়ি মেরে চলে দুর্ভাবনার ঘনতমিস্র রাতে
দখিনা মলয় ক্লান্ত শ্রান্ত হাঁপানীতে ভুগে ভুগে
অশোক বকুল ফোটে না প্রিয়ার হাজাধরা পদযুগে;

কি হবে কাঁচুলি বেঁধে?
দুধের অভাবে সন্তান যার ধুঁকে মরে কেঁদে কেঁদে।'

[—বিগত বসন্ত : উদ্বাস্তু ভারত—১৯০ পৃঃ]

ক্লান্ত, জীবন-যুদ্ধে জর্জরিত মধ্যবিত্ত কিম্বা অতিদরিদ্র ঘরের যৌবনও প্রিয়া-সুভাষিত মঞ্জুষায় অভিভূত হ'তে চায় এবং বিহ্বল হ'তে চায় তা'র মদির স্পর্শের উদ্দামতায়। কেননা রতিপতির শ্রেণীবিচার নেই। কাঁচা বয়সের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'ও হয়তো অবুঝ কামনায় অধীর, অবাধ্য প্রগল্‌ভতায় অস্থির, চাঁদ ধরবার দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত, তাই শেষ পর্যন্ত তা'র কপালে জোটে অপমান আর বঞ্চনার জ্বালা। সতের বছর বয়সেও কবিকণ্ঠে শুনি :

'কত রাতজেগে শোনা রূপকথা
রাঙা রাজকুমারীর প্রেমে,
আনে রাখালের বুকে মধুঋতু
ভয়ে যৌবন ওঠে ঘেমে।'

* * *

'........ রাজকুমারীর বাঁকা চোখে
যদি বিদ্যুৎ যায় খেলে।
জানি নীরবে সে করে নির্বাচন
কোনো আদুরে রাজার ছেলে—'

তাই—

'শুধু চোখে দেখে হায়, ভাললাগা
জানি করুণ কাব্যমায়া;'
যেন শূন্যের চাঁদ শূন্যে থাকে,
মিছে দিঘিতে কাঁপায় ছায়া।'

[—রাজকন্যার প্রতি : উদাত্ত ভারত—৮৯-৯০ পৃঃ]

কবি কখনো কখনো তাঁর অশরীরী প্রেমে অস্থির হয়ে ওঠেন—মনে হয় ধ্বংস হয়ে যাক পুরনো অতীত—কি হবে আকণ্ঠ স্বপ্নমদিরা পানে মাতাল হয়ে? তাঁর অশরীরী নায়িকার 'প্রমত্ত প্রেম-সাধনার বেদীতলে' শুধু অনিন্দিতার বাণী বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসহ। সে-নায়িকা অলভ্যা-সুন্দরিকা—

'আকাশ তোমায় পারেনি জড়াতে বুকে
পৃথিবী পারেনি সাজাতে বাসর ঘর
দূর থেকে সাত সমুদ্র নতমুখে
পিছু হটে গিয়ে তুলেছে ক্ষুব্ধ ঝড়।'

[—ফাল্গুনী : উদাত্ত ভারত—১০৩ পৃঃ]

কবিকণ্ঠের দার্শনিক সান্ত্বনা শুনি :

'অনেক সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রির বুদ্বুদ
দেশ-কাল-পাত্র দিয়ে ঘেরা
ইতিহাসে মিশে গেল,
সে নদী, অদৃশ্য নদী, নেই পিছু-ফেরা
মিনতি-মধুর স্নিগ্ধ কূলের শ্যামল মমতায়।
সেই স্তব্ধ কালের প্রতিমা
নেই সে, যে একদিন বেঁধেছিল অসীমের সীমা।'

[—পাণ্ডুলিপি : কালের প্রতিমা, ১৯৫৮]

আবার কখনো কখনো এক সুগভীর স্পর্শাতীত মহিমায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রিয়ার প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো অপূর্ব রূপ অনাঘ্রাত-সুন্দরতায় উপভোগ করতে চান—

'...ঘুমুলে তোমায় কী যে সুন্দর দেখায়!
সোনার অঙ্গে কাঁপে যৌবন প্রতিটি রেখায় রেখায়।
অগোছালো শাড়ী, মাথায় বিনুনী ভাঙা
বাসনার রঙে রাঙা
বালিশে ছড়ানো কালোচুলে ঘেরা ঘুমন্ত মুখখানি।

রাঙা বাসনায় চাঁদের চুমায়
স্বপ্নবিভোরা তনুটি ঘুমায়
অপলকে চেয়ে থাকি,
সময়ের ঢেউ দোলা দিয়ে যায়
ডাকে রাতজাগা পাখি।

....

নিভৃত নীরব প্রেম ওঠে জেগে
মর্ম-ফুলের সৌরভ লেগে
ছোট ঘরখানি অধীর আবেগে কাঁপে,
ঘুমাও, ঘুমাও জাগাবো না মিছে সৃষ্টির উত্তাপে।'

[—অ-ধরা : উদাত্ত ভারত—১০৫ পৃঃ]

বিমলচন্দ্রের প্রেম-চেতনাও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের দ্বিমুখী প্রেম-চেতনার সমতুল।—নরনারীর মিথুনলীলায় প্রেম কেবল জৈব-কামনার ঘটকালীতেই সিদ্ধহস্ত নয়, জীবনের অপরূপ কাব্যরূপময়তারও অনুপ্রেরক। শেষের কবিতায় ঘড়ার জল ও দিঘির জলের সমস্ত মীমাংসা বিপ্লবীপ্রেমিক বিমলচন্দ্রের প্রেম-কাব্যায়নের সূচীপত্র। তাই কবি আটপৌরে জীবনের নর্ম-সহচরী ও মানস-সহচরীর দোলাচল প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণায় সঞ্চরণশীল। কিন্তু তাঁর কান্তানিভ প্রেমের 'উৎসরূপা' সুদূরিকা স্বাতী,—দৈনন্দিন জীবনের নর্মসহচরী নন, তিনি কবির নিষিদ্ধ এবং ব্যর্থপ্রেমের অশরীরী নায়িকা। যার অনায়ত্ত উপস্থিতির "শুভলগ্নে" কবির অনন্ত প্রশ্নের নিরুত্তর সমাধান—'Sweet love renews thy force'—বার বার নতুন আস্বাদনে ভরিয়ে তোলে কবির "প্রাণ-যাত্রা"র পাথেয়কে।

গত দু'তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রৌঢ় কবি বিমল-চন্দ্রের বিস্ময়কর প্রেমের কবিতাগুলি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। সায়ংকালের বিষাদরক্তিম লাবণ্যে ও সুদূরচারী দার্শনিক অভীপ্সায় কবিতাগুলি নিরবদ্য। হারানো যৌবনের নিষিদ্ধ রাত্রিগুলির চেয়ে আজকের রাত্রিগুলি আরো গভীর, আরো অতল!

'স্পন্দিত ভীরু সে রাতের চেয়ে এ-রাতের গভীরতা
অতলস্পর্শ। শুকতারা জ্বলা মিছে হ'ল পুব রাঙা!
শেষ বিচ্ছেদ-রাত্রির স্বরে আহত অস্থিরতা
বলেনি : 'পুনর্দর্শনায় চ'! মনের আরশি ভাঙা।

ছড়ানো কাচের টুকরোতে প্রতিবিম্বিত শত মুখ
রক্তাভ শতদীর্ণ প্রেমিকা একটি মুখেরই মায়া!
একটি অধর চুম্বনলোভী প্রজাপতি উন্মুখ
এ মনের। বুকে কাঁপে সে রাতের রুপালি প্রতিচ্ছায়া।'

[—স্বাতী-রেবতী-ভাস্বতী : সোমপ্রকাশ ১৩৬৬]

কবি-মনের প্রজাপতি উন্মুখ হ'য়ে থাকে সেই অনন্যা স্বাতীর পুনরুজ্জী-বনের সুরভি-স্বপ্নে!

অর্ধশতাব্দী

অমলেন্দু দত্ত

॥ এক ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষের ব্যক্তিজীবন ও কাব্য-সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিরা এই স্মারক গ্রন্থে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কবির কাব্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করা হ'ল। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কবির জীবনকাহিনী একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসের মতোই নানা ঘটনা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই স্বল্প-পরিসর স্থানে সে আনুপূর্বিক কীর্তিকথা লিপিবন্ধ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং কবি ও তাঁর জনৈক আকৈশোরের বন্ধুর মুখ থেকে কবির জীবন-চরিতের কালানুক্রমিক কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ ক'রে এই জীবনচরিতের কাঠামোটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে রচনা করেছি! অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেখার জন্য রচনাটির মধ্যে হয়তো অনেক ত্রুটি-অসঙ্গতি রয়ে গেল, তাই সর্বাগ্রে পাঠক-পাঠিকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে রাখছি।

উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যক্তিপ্রশস্তি রচনার যুগ এটা নয়, তবু মনুষ্যত্বে ও প্রতিভায় যাঁর অমল জীবন লোকোত্তর, তাঁর চরিত্র বর্ণনায় নিরাসক্ত নিরাভরণ ভাষা প্রয়োগ করা আমার পক্ষে কঠিন। কেননা কাছের মানুষ বিমলচন্দ্রকে আমি দেখেছি, তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তার সত্যস্বরূপ কিছুটা আমি প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করেছি। এই মহান জাতীয় কবিকে আমি চিনেছি ব'লে আমার গর্বের অন্ত নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চারিত্রপূজা"য় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো; আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ; আর মনুষ্যত্ব সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে।"

বিমলচন্দ্রের জীবনচরিত বর্ণনার ক্ষেত্রে কবিগুরুর উপরোক্ত কথাগুলি নির্দ্বিধচিত্তেই প্রয়োগ করতে পারি। বিমলচন্দ্রের সমগ্র জীবনকাহিনীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে পাঠক-পাঠিকা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে আমার এ ব্যাখ্যা অতিশয়োক্তিদোষদুষ্ট নয়। বিমলচন্দ্রের নানা বিচিত্র সংঘাতপূর্ণ জীবন-মেঘের মধ্যে তাঁর কাব্য-প্রতিভা জলদার্চিছটার মতোই নিত্যস্ফূর্ত; এবং তাঁর সমগ্র জীবনধারাটিও দিবালোকের মতোই মনুষ্যত্বের দীপ্তিতে ভাস্বর।

॥ দুই ॥

রুপোর চামচ মুখে দিয়ে গজদন্ত-মিনার-কক্ষে বিমলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি দরিদ্র কেরানি পিতার দরিদ্র সন্তান। অভাব-অনটন-অশান্তি-নির্যাতন বিমলচন্দ্রের সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এই সামাজিক বৈষম্যের পঙ্ককুণ্ডে তবু যে তিনি তলিয়ে যান নি—এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়কর।



১৯৫৩



১৯৫৯

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৭, ইংরাজী ১২ই ডিসেম্বর ১৯১০, সোমবার সকাল দশটায় ১নং বলরাম বসু ফার্স্ট লেনে কবির মাতার মাতুলালয়ে বর্তমান বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে রাশি মিলিয়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল দেবীপ্রসাদ ঘোষ। ১৯১৬ সালে ছ' বছর বয়সে ভবানীপুর নর্থ চক্রবেড়িয়া ইনস্টিটিউশনে (অধুনালুপ্ত) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় কবি-জননী মণিমালা দেবী নতুন করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনোমত নাম রাখেন বিমলচন্দ্র।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই বিমলচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। কবির পৈত্রিক ভদ্রাসন ছিল ৬৩নং চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ। এখনও ঘোষ বংশের কয়েকটি শাখা এ-অঞ্চলে বসবাস করছেন। কবির প্রপিতামহ আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন ঊনবিংশ শতকের নবজাগৃতি আন্দোলনের অন্যতম চিন্তানায়ক ও কবি ডিরোজিওর (Henry Louis Vivian-Derozio 1809-1831) বন্ধু ও শিষ্য। আনন্দমোহন থেকে বিমলচন্দ্রের পিতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ পর্যন্ত, মহাত্মা ডিরোজিও প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদীদের বলিষ্ঠ চিন্তার উত্তরাধিকার ঘোষবংশের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নগেন্দ্রনাথের সেজদা বিপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন সেকালের একজন ভারতবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও অমিতবলশালী মল্লবীর। ইনি শিমলা-দিল্লীতে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কবির পিতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন একজন ঘোরতর নাস্তিক ও তাঁর সেজদার মতোই বলশালী ব্যক্তি। কৈশোরে তিনি হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে তিনি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন দেশের মানুষ ও তাদের বাস্তব জীবন-সংগ্রামের প্রত্যেকটি বিষয় জানবার জন্যে নগেন্দ্রনাথের ছিল অদ্ভুত কৌতূহল। মানুষের কর্ম ও ধর্মের মধ্যে, জীবনযাত্রা-প্রণালী ও জীবন-বিশ্বাসের মধ্যে ধনিক-জীবন ও দরিদ্র-জীবনের মধ্যে অমিল দেখে তিনি বিস্ময়বোধ করতেন। গুরু-পুরুত-পাদরী-মোল্লাদের কাছে তিনি তাঁর বস্তু-জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর পান নি, উত্তর পেয়েছিলেন ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সর, মিল, বেন্থামের গ্রন্থরাজির মধ্যে। নগেন্দ্রনাথ তাঁর ৮।১০ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতে গিয়েছিলেন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের পর তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্মের অনুগামী হতে পারেন নি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, 'নরেন দত্ত যদি আধ্যাত্মিকতার পথে না এসে, পুরোপুরি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নামতেন, তাহ'লে এতদিনে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটে যেতো।' গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের ওপর নগেন্দ্রনাথের ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা।

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিতাইচরণ ঘোষ তখন ব্রহ্মদেশে সরকারী চাকরি নিয়ে সপরিবারে থিনানজুঙে বসবাস করতেন। নিতাইচরণের চেষ্টায় নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশের জেল বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এই চাকরি-জীবনে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর পৈশাচিক বর্ণবিদ্বেষী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে-সময়ে বাঙলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তুমুল জোয়ার চলেছে।

অগ্নিযুগের চিরস্মরণীয় শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির কিছুদিন পরেই নগেন্দ্রনাথ জেলের চাকরির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে

আসেন। ঐ বছরেই তিনি বিবাহ করেন। তাঁর সহধর্মিণী মণিমালা দেবী সেকালের একজন শিক্ষিতা ও সমাজসচেতন মহিলা। স্ত্রীর স্বদেশানুরাগ ও জেলের চাকরির উপর নিজের বিতৃষ্ণার ফলে শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ চাকরিতে ইস্তফা দেন। এই তেজস্বী পিতামাতার প্রথম সন্তান বিমলচন্দ্র ঘোষ।

১৯১৫ সালে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নগেন্দ্রনাথের পৈতৃক ভদ্রাসন নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনে দখল করে নেয় ও তার বিনিময়ে সেকালের জমির দাম অনুসারে যে-টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়, তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পোস্টাল অডিট ডিপার্টমেন্টে (Accountant General, Posts & Telegraphs) অতি অল্প বেতনের নতুন চাকরি সম্বল করে নগেন্দ্রনাথ সপরিবারে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হলেন। সেই থেকে ভাড়াটে বাড়িতেই তিনি বসবাস করতে শুরু করেন।

নর্থ চক্রবেড়িয়া ইনস্টিটিউশনে বিমলচন্দ্র ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯২১ সালে তাঁর পিতা অকস্মাৎ পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের আর্থিক অবস্থা এক চরমতম সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। কবির মাতা সমস্তদিন ব্যস্ত থাকতেন রোগীর সেবায়। ঘরের কাজকর্ম করার জন্য অন্য কোনো লোকও ছিল না। কবির বয়স তখন মাত্র এগারো বছর। এই বালকের উপরই পড়ল সংসারের যাবতীয় কাজের ভার—রান্না করা, বাসন ধোওয়া থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো ভাইবোনদের দেখা-শোনা পর্যন্ত সব তাঁকে করতে হ'ত। ফলে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হল।

দীর্ঘ দু-তিন বছর বিমলচন্দ্রের কিশোর-জীবনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। এই সময়কার দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার ইতিহাস মর্মন্তুদ। পিতার রোগমুক্তির পর সংসারের অবস্থার সামান্য কিছু উন্নতি হলে ১৯২৪ সালে পুনরায় তিনি স্কুলে যেতে শুরু করেন। এবার পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন। এই স্কুল থেকেই ১৯২৯ সালে বিমলচন্দ্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কবির পিতা ঘোরতর নাস্তিক হলেও কবির মাতামহী রত্নমালা সেন ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসে অবিচল নিষ্ঠাপরায়ণা মহিলা। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর মুখে ঈশ্বরমাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী শুনে শুনে শৈশব থেকেই কবির মনে ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের প্রেরণা জাগে। দিদিমার কিন্তু আর একটি বড়ো গুণ ছিল। তিনি ছিলেন কবি। তাঁর নিয়মিত কাব্যরচনার মুগ্ধ শ্রোতা ছিল তাঁর পরম আদরের এই নাতিটি। তাই একথা নিশ্চিতরূপেই অনুমান করা যায় যে বিমলচন্দ্রের কবিপ্রতিভার বীজ তাঁর শৈশবে এই স্নেহশীলা দিদিমার হাতেই উপ্ত হয়েছিল। সাংসারিক দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ঘরের পরি-বেশটি ছিল কবিত্বশক্তি বিকাশের অনুকূল। পিতা নগেন্দ্রনাথ প্রত্যহ ভোরে এবং সন্ধ্যায় উদাত্তকণ্ঠে উপনিষদ ও গীতা আবৃত্তি করতেন। মাতা মণিমালার কণ্ঠস্থ ছিল ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গ-গৌরব কবিদের বিখ্যাত কবিতাবলী। জননীর কণ্ঠে এই সব কবিতার সুললিত আবৃত্তি বালক বিমলচন্দ্র বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে শুনতেন। মণিমালা দেবী এক-জন মহীয়সী করুণাময়ী মহিলা। পরের উপকারের জন্য তিনি জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রভাব পুত্রের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে। মাঝে মাঝে বাড়িতে কীর্তন, ভাগবত-কথা, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতির আসর বসতো। শুনে শুনে বহু গান শিখে ফেলেছিলেন বিমলচন্দ্র। দশ-বারো বছর বয়সের

তাঁর প্রথম রচনাগুলির অধিকাংশই গান। এই গানগুলিরই একটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় "সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" নামে একটি অধুনালুপ্ত পত্রিকায়।

পরলোক ও পরমেশ্বরে অবিশ্বাসী নগেন্দ্রনাথ নিয়মিত ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যোগ-প্রাণায়ামাদি করতেন। তার প্রভাবও বিমলচন্দ্রের কিশোর মনের উপর পড়ে। শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ শেষ হবার পর থেকেই বিমলচন্দ্রকে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বর্ধমান রাজ-বাটির সংস্করণ গদ্য-মহাভারতের এক-একটি অধ্যায় পড়ে শোনাতে হতো পিতার আদেশক্রমে। একটি দিনও এ পাঠ বন্ধ যেতো না। এইভাবে শৈশবেই অর্থ না বুঝেও সমগ্র মহাভারতখানি তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে সংস্কৃত-ধর্মী বাঙলা ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ অধিকার জন্মায়। এ ছাড়া, বাঙলা হরফে ছাপা সংস্কৃত গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি নিয়মিত পাঠ করে পিতাকে শোনাতেন। কৈশোরে বিদ্যালয় ছাড়াও তিনি মহামহোপাধ্যায় দুর্গা-চরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের ভাগবত চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন এবং এখানে প্রায় ১০।১২ বৎসর তিনি ভারতীয় কাব্য-দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন।

॥ তিন ॥

১৬-১৭ বছর বয়সে বিমলচন্দ্র দুজন রাজনৈতিক কর্মীর সংস্পর্শে আসেন। এঁদের একজন হলেন জনৈক আত্মগোপনকারী বাঙালী নেতা ও অন্যজন পুণার শ্রমিক কর্মী ডব্লিউ, এস, কার্ডিলে। অন্তরংগ আলাপের মধ্য দিয়ে এঁরাই সর্ব-প্রথম কবিকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কার্ডিলে কিশোর কবিকে সংগে নিয়ে মাঝে মাঝে খিদিরপুর এলাকায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে যেতেন। এই মারাঠী শ্রমিক কর্মীর কাছেই বিমলচন্দ্র তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম কার্ল মার্ক্সের নাম শোনেন ও "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র টাইপ-করা কপি দেখেন। কবি তখন পূর্ণমাত্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসী। সপ্তাহে একদিন ক'রে নিয়মিত রামকৃষ্ণ মিশনের 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে যাতায়াত করেন। সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশ পেলে তাঁদের সংগ ছাড়েন না। ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। ধর্ম-গ্রন্থাদির প্রভাবে তিনি দৃঢ়তার সংগে বিশ্বাস করতেন, ভগবান একদিন অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীর বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তিকে উচ্ছেদ করবেন। কার্ডিলে এসব কথা শুনে হাসতেন ও কবিকে নানা যুক্তিতর্কে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতেন কবির মন থেকে মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস দূর করতে। কিন্তু সফল হন নি। কেননা কবির বৈদান্তিক ও ঔপনিষদিক ধ্যানধারণাগুলিকে দূর করতে হ'লে বস্তুবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার যে জোরালো যুক্তি ও ডায়ালেক-টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার, কার্ডিলের তা ছিল না। জড় ও চৈতন্যের জটিলতম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অপরদিকে বিমলচন্দ্র এইসময় কয়েকটি জড়বিজ্ঞান-বিরোধী কবিতা লিখে সন্ন্যাসীদের, গান্ধীবাদীদের ও শ্রীঅরবিন্দপন্থীদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। তথাপি কবির মনে শান্তি ছিল না। শ্রেণীসংঘাতময় বাস্তব সমাজ তাঁকে অস্থির ক'রে তুলতো। তিনি সমাজজীবনে আধ্যাত্মিকতার সংগে বাস্তবতার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন না।

জড়বিজ্ঞানবিশ্বাসী নাস্তিক পিতা নগেন্দ্রনাথ নীরবে পুত্রের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করতেন। তিনি একটি দিনের জন্যেও জোর খাটিয়ে পুত্রকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করেন নি। বরং পুত্র কোনো প্রশ্ন করলে, তিনি বলতেন, "নিয়মিত সজাগ মনে অধ্যয়ন ক'রে যাও, একদিন তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। আমার চোখে জগৎ দেখতে চাও কেন? নিজের চোখ যেদিন ফুটবে, সেদিন নিজেই সত্যকে আবিষ্কার করবে।" নগেন্দ্রনাথ কোনোদিন পুত্রের স্বাধীন চিন্তায় বাধা দেন নি। তিনি G. B. S.-এর ভাষায় বলতেন, "The vilest abortionist is he, who attempts to mould a child's character." তিনি পুত্রের জ্ঞানান্বেষী চিত্তের আকুলতা দেখে মুগ্ধ হতেন ও প্রয়োজনমতো সৎগ্রন্থাদি কিনে দিতেন।

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ ল্যান্সডাউন রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী। বিমলচন্দ্র ছাত্রজীবন থেকেই মাঝে মাঝে এই মনীষীদের কাছে যেতেন বিপুল জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে। নীরবে শুনতেন তাঁদের অমূল্য উপদেশ-বাণী। তাতে কবির মনের প্রসারতা বাড়তো বটে, কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান পেতেন না। কারণ বড় বড় পণ্ডিতরা সমাজের নীচের তলার মানুষদের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা বিচরণ করতেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রজ্ঞার উচ্চতম মার্গে। এঁদের উচ্চাঙ্গ দার্শনিক আলোচনা শুনতে শুনতে বিমলচন্দ্র মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো খিদিরপুর এলাকার শ্রমিক বস্তীগুলির মর্মস্পর্শী দৃশ্য। তিনি মনে মনে ভাবতেন বিশ্ববরেণ্য মনীষী-দের জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তত্ত্বাবলী যদি নির্যাতীত ও শোষিত কোটি কোটি মানুষের দুঃখবিমোচন না করতে পারে তবে কি হবে সে জ্ঞান অর্জন করে?

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ৩২ ঘোড়াব গাড়ী চড়ে সভাপতিত্ব কবতে আসেন। দরিদ্র পরাধীন দেশের রাজ-নৈতিক নেতাকে সম্মানিত করার জন্যে এই অর্থহীন বিলাসিতা ও অনাবশ্যক আড়ম্বর বিমলচন্দ্রের ভাল লাগে নি। তিনি তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। সরকারী কর্মচারী পিতাকে লুকিয়ে G.O.C. সুভাষচন্দ্রের অধীনে কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য রচনা করেন। এই কবিতাগুলি তখনকার সভা-সমিতিতে কবি জনগণকে আবৃত্তি করে শোনাতেন। এই সময়কার কবিতা-গুলিতে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলামের প্রভাব দেখা যায়। কংগ্রেস নেতারা বিমলচন্দ্রকে উৎসাহিত করতেন। নানা আদর্শের বিপরীতধর্মী সংঘাতে বিমলচন্দ্রের মন তখন উদ্বেলিত। একাধারে অধ্যাত্মবিশ্বাসপ্রসূত বৈরাগ্য, অমিত শক্তি অর্জনের জন্য শরীরচর্চা, কাব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভের সহায়ক জ্ঞানানুশীলন ও পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সংকল্প বিমলচন্দ্রের যৌবন-উন্মেষ-কালকে মাতিয়ে রেখেছিল। বিমলচন্দ্র ভবানীপুরে ননীবাবুর আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতেন। কুস্তিতে, মুষ্টিযুদ্ধে, লাঠি ও তরবারী খেলায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তখনকার দিনে প্রতি বৎসর শরৎ-কালে বীরাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। এই উৎসবে একবার সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি বিমলচন্দ্রের তরবারী খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পদক পুরস্কার দেন। আন্তর্প্রাদেশিক কুস্তি-প্রতিযোগিতাতেও

বিমলচন্দ্র অনেকগুলি পদক ও ইনাম লাভ করেন। অসাধারণ মানসিক শক্তিতে ও দুঃসাহসে বিমলচন্দ্র ছিলেন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। যার জন্য সুভাষচন্দ্র কবিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য! ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী তাদের বলিষ্ঠ দাবী দেশনায়কদের কাছে জানাবার জন্য সুসংগঠিত মিছিল বের করে পার্ক সার্কাসের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংবাদ শুনে জি, ও, সি-র শিবির থেকে হুকুম এল ভলান্টিয়ার বাহিনী যেন অবিলম্বে ব্যারিকেড রচনা করে—শ্রমিক মিছিলের পথ রোধ করে। এ আদেশ শোনা মাত্র বিমলচন্দ্র ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে তৎক্ষণাৎ ভলান্টিয়ারের ব্যাচ ছিঁড়ে ফেলে কংগ্রেসের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চলে আসেন। তিনি বলেন, যে-জাতীয়-আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকদের স্থান নেই সেখানে তিনি থাকেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেন নি। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন অনলসভাবে। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হলেও শোষিত-নির্যাতিত শ্রমিক-কৃষকরাই বিমলচন্দ্রের বৈপ্লবিক কবিতার উৎস।

১৯২৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বিমলচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। বড় হ'য়ে বৈজ্ঞানিক হবেন, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি আজও মনে করেন, কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোথায় যেন একটা আত্মিক যোগসূত্র আছে। ছাত্র হিসাবেও তিনি কোনোদিন অমনোযোগী ছিলেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম বার্ষিক ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছাড়তে হয়। সেও এক বিশেষ ঘটনা :

প্রতি বৎসর 'রেক্টরস-ডে'-তে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা সাংস্কৃতিক উৎসব করতেন। ১৯২৯ সালের উৎসবে জনৈক ভারতীয় ছাত্র একটি স্বদেশপ্রেমমূলক স্বরচিত ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। প্রবন্ধটির মধ্যে একস্থানে বৈদেশিক শাসনের অভিশাপ সম্পর্কে কিছু জ্বালাময়ী ভাষা ছিল। কলেজের বেলজিয়ান পাদরিরা প্রবন্ধটি শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে জোর করে পাঠ বন্ধ করে দেন, কারণ কলেজের মধ্যে কোনোপ্রকার রাজনীতি প্রবেশ করতে দেবেন না বলে তাঁরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে, পাদরি-অধ্যাপকদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের তুমুল বচসা শুরু হয়। জনৈক প্রবীণ পাদরি অকস্মাৎ মঞ্চের উপর উঠে অত্যন্ত আপত্তি-কর ভাষায় ভারতীয়দের অপমান করেন। পরিণামে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্র ও পাদরিদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের রীতিমত হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। রেক্টর সাহেব পুলিশ কমিশনারকে ফোন করলেন। তার ফলে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র এক-যোগে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে ধর্মঘট ঘোষণা করেন। এই ছাত্র ধর্মঘটের অন্যতম নেতা ছিলেন বিমলচন্দ্র। এই উপলক্ষ্যেই তিনি ছাত্রসভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় ও ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের সমর্থক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে ধর্মঘট দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, সংবাদপত্রেও এ নিয়ে খুব আলোড়ন হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। বহু ছাত্র এক-যোগে সেন্ট্ জেভিয়ার্স ছেড়ে অন্যান্য কলেজে চলে যান।

বিমলচন্দ্রকে এই সময়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ-কর্তৃপক্ষ অযথা হয়রানি করেন। কারণস্বরূপ বলা হয় তিনি নাকি হাঙ্গামার সময়ে জনৈক পাদরিকে আঘাত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় তিনি সার্টিফিকেট পান এবং আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন।

॥ চার ॥

১৯৩০-৩১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে যখন মুক্তি আন্দোলন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, বিমলচন্দ্র তখন দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক ছাত্র-কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি 'চক্রতীর্থ' নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক বন্ধুর সহযোগিতায়। সর্বশ্রী বিমল মিত্র, অনুপমকৃষ্ণ বসু, কবি করুণা-ময় বসু, হীরালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকরা ছিলেন সদস্য। স্থায়ী সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা সাহিত্য আলোচনা ও নানাবিধ সংগঠনমূলক কাজ করতেন।

এই সময়ে তাঁর পিতার সংসারে পুনরায় নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। কবির দশ-এগারোটি ভাইবোন—পিতাই পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। সুতরাং অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পিতার ইচ্ছায় বিমলচন্দ্র কলেজ ছাড়লেন এবং ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরই অফিসে একটি অস্থায়ী কেরানি-পদে নিযুক্ত হলেন। আজও এজন্য কবির ক্ষোভের অবধি নেই—কেননা চাকরিজীবনে প্রবেশ করাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্র-জীবনের যাবতীয় উচ্চাশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে চাকরিটি ছিল অস্থায়ী এবং ছ-মাস কাজ করার পরই তা চলে যায়। বিমলচন্দ্রের মন আরও বিষণ্ণ হল, কেননা তাঁর যে একূল-ওকূল—দুকূলই গেল! সুতরাং তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভাগবত-চতুষ্পাঠীতে পড়বার সময় থেকেই তিনি সংসারে বাস করেও ছিলেন সন্ন্যাসী। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁব ছিল শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত বৈরাগী বেশ। চাকরি যাবার পর অন্তরের এই সন্ন্যাসীটি পুরোপুরি আত্মপ্রাকশ করল। গেরুয়া ধারণ করে প্রায় এক বৎসরকাল তিনি উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে পর্যটন করেন। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতে তাঁর মন তখন অস্থির।

১৯৩২ সালের মার্চ মাসে ঐ অফিসেই একটি স্থায়ী পদে তাঁর পুনর্নিয়োগ হয় এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি চাকরি করেন পূর্বেই বলেছি চাকরিতে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। কবিসত্তার সঙ্গে কেরানিসত্তার সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। চাকরি-জীবনের বাধ্যবাধকতা ও সরকারী শৃঙ্খলা মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে এ-বিষয়ে লিখিতভাবে কৈফিয়ৎ তলব করায়, তিনি তার উত্তর না দিয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। কেরানি-জীবনের অভিজ্ঞতাও কী কম মর্মান্তিক! চাকরিতে উন্নতিলাভের বিন্দুমাত্র অভিলাষ তাঁর ছিল না। সহকর্মীরা যখন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবির উপরওয়ালার আসনে বসেছেন এবং কবিকেও পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করেছেন, তখন বিরক্ত হয়েই তাঁকে জবাব দিতে হয়েছে, "কেরানিগিরি করার জন্য বিমলচন্দ্র ঘোষ জন্মায় নি!" সতের বছরের পাকা-চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি তাঁর কথার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

॥ পাঁচ ॥

বিমলচন্দ্র ১৯৩৫ সালে স্বনির্বাচিতা পাত্রী শ্রীমতী রেণুকা দেবীকে বিবাহ করেন। কবিপত্নী উচ্চশিক্ষিতা নন কিন্তু রূপে-গুণে ও চারিত্রিক

মাধুর্যে তিনি অসামান্যা মহিলা। সংসার সম্পর্কে উদাসীন কবির জীবনে এই মহিমময়ী নারীর স্নেহ, প্রেম, সেবা ও সাহচর্য কবির কাব্যপ্রতিভা উন্মেষে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। বিমলচন্দ্র ১৯৪১ সালে স্থান সংকুলানের অভাবের জন্য পিতার সংসার থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস শুরু করেন। সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে তাঁর প্রথম বাসা। এই বাসা থেকে ঐ বছরেরই ১লা মে তারিখে কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'দক্ষিণায়ন' প্রকাশিত হয়। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছর। ভারতবর্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভের ঘন ঘন বজ্রবিদ্যুৎচমক জনগণ চিত্তকে উদ্বেল করে তুলেছে। বিমলচন্দ্র 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' সভ্য হলেন। এই সময়ে তাঁর লেখনীতে যেন জোয়ার এসেছিল। কবির অসংখ্য ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কবিতা দেশের প্রগতিশীল চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

জার্মান দার্শনিক নীৎসে ও গীতার অবতারবাদ তাঁর চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে তিনি কার্ডিলে ও অন্যান্য সমাজ-সচেতন বন্ধুদের কোনো বস্তুবাদী যুক্তি-তর্কে কর্ণপাতও করতেন না। প্রথম যৌবনে তিনি তাঁর কাব্যের প্রেরণা লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন থেকে। কিন্তু অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী হলেও বিমল-চন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের উপর ছিলেন খড়্গহস্ত। তাই তিনি মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক নিষ্ক্রিয়তা বিসর্জন দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতেন। দেশেব কোটি কোটি অসহায় মানুষের শোষিত-পান্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে ধনিক ও জমিদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলে উঠতেন। এই সময়কার বহু কবিতার মধ্যে কবির এই সমাজবিদ্রোহী মনোভাবের প্রতি-ফলন দেখা যায়। অথচ আধ্যাত্মিকতায় সুদৃঢ়প্রত্যয়শীল মন তাঁর মাঝে মাঝে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রেণী-সংঘাতের মিল তিনি খুঁজে পেতেন না।

'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' বা 'যত্র জীব তত্র শিব' প্রভৃতি সুমহান বাক্যগুলির মধ্যে যে সত্য আছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার শোচনীয় ব্যতিক্রম দেখে কবির মনে হতো শিব যদি মঙ্গলময়, ব্রহ্ম যদি সর্বভূতে বিরাজিত হন তবে জীবের জীবনে এত অমঙ্গল, এত দুঃখ কেন? এই সময় থেকে মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স্ সম্পর্কে কবির মনে প্রবল সংশয় দেখা দেয়। তাঁর মনে পড়ে দেবর্ষি নারদের কথা :

> ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
> অষ্টসিদ্ধির্যুক্তাম্ পুনর্ভবং বা।
> আর্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজা
> মন্তঃ স্থিতো যেন ভবন্ত্য দুঃখাঃ ॥

অর্থাৎ 'ঈশ্বরের কাছে আমি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত স্বারূপ্য চাই না, আমি কেবল নিজের জন্যও নির্বাণ কামনা করি না, আমি চাই—আমি যেন সকলদুঃখভাক্ জীবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের যতপ্রকার ক্লেশ আছে সব আমার নিজের করে নিতে পারি। যার ফলে তারা যেন সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে।' এমনি ক'রে বিমলচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদির মধ্যে বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণ-মন্ত্র খুঁজতেন। কল্যাণ-মন্ত্র খুঁজতেন বরেণ্য মহাকবিদের কাব্যধারার মধ্যে। শুধু ভারতীয় নয়, ইরাণের তাহির, সাআদী, হাফিজ, জালালুদ্দিন রুমি, ওমর প্রভৃতি কবিদের রচনাবলীর ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদগ্রন্থগুলি বিমলচন্দ্র

শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। কবীর, দাদু, মীরাবাই ও তুলসীদাসের বহু কবিতা তিনি বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। বৌদ্ধভিক্ষুণী থেরীদেরও বহু গাথার • পদ্যানুবাদ নানা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মৈথিলী ও সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি অনেকগুলি গান ও স্তোত্র রচনা করেন।

একজন প্রথম শ্রেণীর গীতিকার হিসাবে বিমলচন্দ্র স্বনামধন্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুরশিল্পীদের কণ্ঠে বিমলচন্দ্রের রচিত গানগুলি বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করে। গানগুলি উচ্চশ্রেণীর ভাবসম্পদে ও কাব্যধর্মিতায় অতুলনীয়।

॥ ছয় ॥

ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যকে অবলম্বন ক'রেই বিমলচন্দ্র তাঁর বস্তু-জিজ্ঞাসার আংশিক উত্তর পেয়েছিলেন। এ-উত্তর বিজ্ঞানসম্মত না হলেও অত্যন্ত জোরালো লোকায়তবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কপিল, চার্বাক, গৌতম বুদ্ধ ও বৃহস্পতির রচনাবলী এই সময় বিমলচন্দ্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ' সূত্র থেকে 'না স্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ' এবং বুদ্ধের চারিটি আর্যসত্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিমলচন্দ্র তাঁর নবজাগ্রত বস্তুবাদী মননের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করেন। একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখছি যে বিমলচন্দ্রের মন শুধু ভারতীয় দর্শন পরিক্রমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টট্ল্, জেনোফোন, পিথাগোরাস থেকে শুরু করে সোপেনহাওয়ার, কান্ট, হেগেল, অগাস্টস কোঁতে, ডেভিড হিউম, স্পেন্সার, ডারুইন, হোয়াইটহেড, রাসেল, হাক্সলী প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের গ্রন্থরাজিও তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসায় অধ্যয়ন করেছেন। দেশের ও বিদেশের প্রত্যেকটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস কবির নখদর্পণে। ১৯১৭ সালে মহান অক্টোবর বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সমস্ত বিশ্বের বুর্জোয়া ভাববাদী চিন্তার ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়েছিল। সর্বহারা বিপ্লবের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে নতুন গণচেতনায় উদ্দীপ্ত এক নতুন সাহিত্য পৃথিবীর দেশে দেশে জন্মলাভ করে। এই ঐতিহাসিক কারণেই কবি বিমলচন্দ্রের কাব্যাদর্শের মধ্যেও আসে এক আমূল পরিবর্তন। তিনি আশৈশবের মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভ করে মার্ক্সীয় দর্শনের আলোয় নিজের সদাজাগ্রত চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন। লেনিন ও ম্যাক্সিম গর্কির রচনাবলী বিমলচন্দ্রের আধুনিকতম কাব্য-সাধনার দীপাধার।

বিমলচন্দ্রের কলেজ-জীবনের সমসাময়িক কালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য সাপুরজী সাক্লাতওয়ালা ভারতবর্ষে আসেন। মহাত্মা গান্ধী তখন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একচ্ছত্র নেতা। সাপুরজীর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার হয়। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আধা-আধ্যাত্মিক ও আধা-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেছিলেন সাপুরজী সাকলাতওয়ালা। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে রীতিমত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধিতা করেন। বস্তুবাদী সাকলাতওয়ালা গান্ধীজীর এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, চরকা ও খদ্দরে দেশের মুক্তি নেই। শিল্পোন্নয়ন না হলে সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব। ইতি-

হাসের অলঙ্ঘ্য বিধানে মানুষের দৃষ্টি সামনের দিকেই প্রসারিত—এই অগ্রগামী মানবচেতনাকে আর পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। বিমলচন্দ্র সংবাদপত্রে এঁদের বিতর্কের বিবরণীগুলি পাঠ করে সাপুরজী সাকলাতওয়ালাকে মনে মনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। তখন থেকে বিমলচন্দ্র মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও দর্শনমূলক গ্রন্থগুলি অত্যন্ত যত্নসহকারে পাঠ করতে শুরু করেন। তাঁর মনের ঔপনিষদিক-বৈদান্তিক ভিত্তিভূমির উপর মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদের সুদৃঢ় ইমারত অত্যন্ত ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে।

বিমলচন্দ্র তাঁর কবি-জীবনের গোড়া থেকেই সমসাময়িক কোনও সাহিত্যিক গোষ্ঠী বা দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। ফলে দলীয় প্রচারের অভাবে তাঁর কাব্য-প্রতিভার ব্যাপক-স্বীকৃতি বহু বিলম্বে হয়েছে।* অত্যুগ্র ব্যক্তি-সচেতনতা ও দুর্দমনীয় ক্রোধ—বিমলচন্দ্রের সহজাত ও বংশগত চারিত্রিক অসঙ্গতি। কবির অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে এই বৃত্তি দুটি খাপ খায় না। যদিও তাঁর ক্রোধের কারণগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত—তথাপি বর্তমান সমাজে যে কুশলী-কৌটিল্যবুদ্ধি ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সহায়ক,—সেই চাতুর্যবঙ্কিম কুশলী অমায়িকতা ও মৌখিক সহনশীলতার পথে বিপ্লবী কবি বিমলচন্দ্র কোনদিন পদক্ষেপেরও চেষ্টা করেন নি। একমাত্র সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকদের রাজনৈতিক ও সংগ্রামী নেতৃত্ব ছাড়া বিমলচন্দ্র আর কোনও শ্রেণীর মাতব্বরী সহ্য করেন না। ফলে তাঁর আর্থিক দুরবস্থারও অবসান হ'ল না, ওপরতলার সাংস্কৃতিক-সমাজে সুলভ প্রতিষ্ঠাও তিনি অর্জন করতে পারেন নি। শ্রমিক ও কৃষক সমাজে কবির জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর।

॥ সাত ॥

কলকাতা ও শহরতলীর কল-কারখানা এলাকায় শ্রমিক আন্দোলনের কোনো সভা-সমিতি হ'লে, কবি নিয়মিতভাবে সেখানে যোগদান করতেন। এইভাবে বহু জঙ্গী শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে এবং আজো তা অটুট রয়েছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবি শৈশবাবস্থা থেকেই শ্রমিকজীবন স্বচক্ষে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের বাসাবাড়ির কাছেই ছিল বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকদের বস্তি। কবি সেখানে যেতেন; তাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলা করতেন। তাদের দুঃখ-বেদনা-হাসি-আনন্দের তিনিও যেন একজন অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন)। কেবল শ্রমিক এলাকা নয়, গ্রামাঞ্চলে কৃষক পরিবারের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা জন্মেছিল। চাকরিজীবনে ছুটির দিন এলেই কবি

---

*তিনি কোনোদিনই বিত্তবান সমাজের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন নি ব'লে তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলির নিয়মিত প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তাঁর অধিকাংশ বই সহৃদয় শুভানুধ্যায়ী-দের অর্থানুকূল্যে ও চাঁদায় বেরিয়েছে। 'দক্ষিণায়ন' বেরিয়েছিল কবির গরীব বন্ধুদের চাঁদায়। 'উলুখড়' প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন দরদী কথাশিল্পী অন্নদাশংকর রায়। 'উদ্বাস্ত ভারত' প্রকাশের সমস্ত খরচ দেন কবির মধ্যবিত্ত ভক্ত ও বন্ধু শ্রীশৈলজাভূষণ ঘোষ। বর্তমানে কবির প্রত্যেকটি বই বাজারে দুষ্প্রাপ্য। কবির অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয়।

একটি ব্যাগের মধ্যে তাঁর কবিতার খাতা নিয়ে লোক্যাল ট্রেনের যাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়তেন। কোনো স্টেশনে নেমে চলে যেতেন গ্রামের মধ্যে। আলাপ করতেন রাস্তার লোককে ডেকে। বসতেন মাঠের আলে কোনো চাষীর পাশে। আবৃত্তি করে শোনাতেন তাঁর কবিতা। শুধু কবিতা শোনানোই নয়, তাদের জীবনসংগ্রামের কাহিনী সংগ্রহ করতেন অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে। কবির মনে তখন নবলব্ধ জ্ঞানের প্রভাবে এক নতুনতর জীবন-জিজ্ঞাসা আকুলি-বিকুলি করছে। এ তারি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষের চরমতম লাঞ্ছিত ও শোষিত জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই আধ্যাত্মিকতা থেকে মার্ক্সবাদে উত্তরণ তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই সময়কার কবিতাগুলির মধ্যেও বলিষ্ঠ বস্তুবাদী চেতনার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ কবি। আমরা সকলে তাঁকে কবি বলেই জানি। তিনি সংগ্রামী মানুষের কবি, দুঃখী মানুষের কবি। তাঁর কবিতা নিরুৎসাহীকে নূতন উদ্যমে জেগে ওঠার মন্ত্র দেয়, প্রেমহীন. শান্তিহীন মৃতকল্প মানুষকে উজ্জীবিত করে। কবি কিন্তু নিজেকে বলেন দার্শনিক। কবি এবং দার্শনিক এ কথা দুটির মধ্যে শব্দতাত্ত্বিক যে ভিন্ন অর্থই খুঁজে বা'র করুন না কেন, বিমলচন্দ্রের মধ্যে আমি তার কোনো অমিল খুঁজে পাই নি। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে. সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর যে সাধনালব্ধ জ্ঞান তা একটি বিশেষ দর্শনের অঙ্গীভূত—আর তিনি যে কবিতা সৃষ্টি করেন তা এই দর্শনেরই ভিত্তি-আশ্রয়ী। অতএব বিভেদ কোথায়? যাঁর দৃষ্টি কেবল উদার আকাশকে অবলম্বন করে আবর্তিত—মাটির মানুষের জীবনে যাঁর দৃক-পাত নেই. তিনি কী করে সার্থক সৃষ্টির দাবি করতে পারেন? কাব্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকা কবি বিমলচন্দ্রের রচনার মধ্যে এ-দুয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণই দেখতে পাবেন।

বিমলচন্দ্রকে যাঁরা বাল্যকাল থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন তিনি তাঁর সম-বয়সীদের সঙ্গে মিশেছেন খুব কমই। তাঁর যত ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে প্রবীণ ও জ্ঞানে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে। যে উঁচু সুরে বিমলচন্দ্রের মনের তার বাঁধা ছিল. সমবয়সীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার পক্ষে তা অনুকূল ছিল না. অতএব অফিস, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, জ্ঞানীগুণীদের আড্ডা ও সভা-সমিতিতেই সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি তাঁর সময় কাটতো। পরম বিস্ময়ের কথা এই যে গত তিরিশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর নিদ্রার সময় মাত্র চার ঘণ্টা। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পূর্বে তিনি কোনোদিন শয্যাগ্রহণ করেন না। রাত্রিই তাঁর কাব্যরচনার সময়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামও তাই 'জীবন ও রাত্রি'। কবির হিতৈষীরা স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় তাঁকে রাত জাগতে বার বার নিষেধ করেছেন কিন্তু কবি সে কথায় কান না দিয়ে হেসে বলেছেন: 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—যে-রাত্রে সমস্ত জীব, সর্বভূত সুপ্তিমগ্ন থাকে. সে-রাত্রে একমাত্র জেগে থাকেন সংযমী।

এই তো সেদিন। জীবনী রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে তাঁর কাছে গিয়েছি। তক্তপোষের ঢালা বিছানার উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন কবি। তক্তপোষের কাছে একটি চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসেছি আমি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কত বিচিত্র ঘটনা! ব্যক্তিমনের রূপালি কয়াশা ভেদ করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একের পর এক নোট করে নিচ্ছি আমি। সবই

হয়তো এ রচনায় প্রয়োজন হবে না—কিন্তু সঞ্চয়ী মন আমার—জমিয়ে রাখতে দোষ কি? কবিতা লেখার প্রসঙ্গে একসময়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই-যে দীর্ঘ দিন রাত জেগে কবিতা লিখছেন—এই অসুস্থ শরীরেও কি সে ধকল সইবে?

উত্তরে কবি বল্লেন, 'সময় কোথায়? জীবিকা আর জীবনের যন্ত্রণা যে আমার কবিতা লেখার সময়কে রাক্ষসের মত গ্রাস করছে। গরীবের ঘরে জন্ম—দু-বেলা পুষ্টিকর খাদ্য জোটে না. সাংসারিক নানা অশান্তি-অভাব-অভিযোগে দুশ্চিন্তার অবধি নেই। সকাল থেকে রাত্রি এই জীবন যন্ত্রণার বোঝা নিয়েই যদি কাটে, কবিতা লিখব কখন? সুখ কাম্য হলেও সুখ তো এই অভিশপ্ত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মেলে না! সান্ত্বনা? সে তো অর্থহীন! ভালো ভালো কথা সারা জীবন ধরেই শুনে আসছি—তার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সম্পর্ক কোথায়? জীবন শেষ হয়ে আসছে, সময় নেই, সংসার সময়কে গিলে খাচ্ছে! রাত্রি ছাড়া মুক্তি কোথায়? তাই সারারাত কবিতা লিখি। কী লিখি আগামী কাল তার বিচার করবে।"

কবির মুখ থেকে এই কথাগুলি শোনার পর একজন অনুজ কবি হিসেবে তাঁর অন্তরের নিগূঢ় বেদনায় যেমন দুঃখবোধ করলাম সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে, উদ্দীপনায় আর গর্বে তেমনি আমার বুক যেন দশহাত হয়ে উঠলো। অন্তরে-বাহিরে এমনি একজন কবিকে আমরা পেয়েছি, তাঁর যুগে বাস করছি দিনের পর দিন তাঁর কাছে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি!

১৯৫৩ সালে সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস-এ আক্রান্ত হয়ে কবি প্রায় আট ঘণ্টাকাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন এবং চেতনা সঞ্চারের পর তাঁর শরীরের ডান দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অকেজো হয়ে যায়। এ-অবস্থায় তিনি প্রায় ছ'-সাত মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। "অতন্দ্র প্রহরী' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি তাঁর রোগশয্যার রচনা। একটু সুস্থ হতে না হতে ১৯৫৪ সালে কবি তাঁর পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ শুনে দ্বিতীয়বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়েছেন বটে তবে কবির স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। অথচ, মাঝে মাঝে ভাবি, কেমন করে এই ছ'টা বছর ধরে কবি একটানা বিস্ময়কর সব কবিতা লিখে যাচ্ছেন! মন্ত্র-সিদ্ধিতে বিমলচন্দ্র বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি বস্তুবাদী। স্ট্যালিনের ভাষায় তিনি বলেন: 'Writers are the engineers of human soul!'

এই মহান গণ-চৈতন্যই কবির সমস্ত কাব্যের উৎস। জরা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, উপেক্ষা-অপমান-অনাদর কবি সহ্য করেছেন সারা জীবন, কিন্তু কোনোদিন কোথাও কারো কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। মহান অস্ত্রোভ্স্কির কথা মনে পড়ে—হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই—তবু কী অসামান্য প্রতিভার অপরি-সীম প্রাণশক্তি! কবি বিমলচন্দ্রের মধ্যেও এই শক্তির আভাস আমি দেখেছি। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও দুর্বলতা এতখানি তীব্র। কাছের মানুষ বিমলচন্দ্রকে যে দেখে নি, সে শুধু তাঁর হারানো-ছড়ানো কয়েকটা কবিতা পড়ে তাঁর স্বরূপ জানতে পারবে না—এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। আমার মনে হয়েছে বিমলচন্দ্র যেন এক 'Stupendous storehouse of energy!' অমিত প্রাণশক্তির জীবন্ত আধার!

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। **জীবন ও রাত্রি** (কাব্যগ্রন্থ)--প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ সাল। প্রকাশক : নালন্দা ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা-২০। দাম : এক টাকা।

২। **দক্ষিণায়ন** : প্রথম প্রকাশ—১লা মে ১৯৪১। প্রচ্ছদপট : অনিল ভট্টাচার্য। প্রকাশক : কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯। দাম দেড় টাকা।

৩। **উলুখড়** (এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা)—প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৪৩। প্রচ্ছদপট : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক : কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯। দাম : চার আনা।

৪। **দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা** : প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২ সাল। প্রচ্ছদপট : স্বয়ং কবি। প্রকাশক : সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩/২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

৫। **ফতোয়া ১৮৪৮-১৯৪৮** : প্রথম প্রকাশ : ১৩৫২ সাল। প্রচ্ছদপট : সূর্য রায়। প্রকাশক : সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩/২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : আট আনা।

৬। **নানাকিং** : প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮ অক্টোবর (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

৭। **হাতে খড়ি** (শিশুবোধ স্বরবর্ণের ছড়া) : প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯। প্রচ্ছদ-পট ও প্রত্যেকটি বর্ণের চিত্ররূপ : সত্যজিৎ রায়। প্রকাশক : দীপঙ্কর-ভবন, কলিকাতা-১৩। দাম : এক টাকা।

৮। **সাবিত্রী** : প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৫১। প্রচ্ছদপট : সূর্য রায়। প্রকাশক : কাব্যলোক, ৫বি বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬। দাম : আট আনা।

৯। **সপ্তকাণ্ড রামায়ণ** . প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫১। প্রচ্ছদপট : বিজন চৌধুরী। প্রকাশক : কাব্যলোক, ৫-বি বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬। দাম : আট আনা।

১০। **বিশ্বশান্তি** : প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫১। প্রচ্ছদপট : অজ্ঞাত শিল্পী। প্রকাশক : সন্তোষকুমার চ্যাটার্জি, ১৯৯ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। দাম : চার আনা।

১১। **ভুখা ভারত** : প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫১। প্রচ্ছদপট : অমল সেন। প্রকাশক : কাব্যলোক, ১ যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। দাম : আট আনা।

১২। **ছায়াপথ** (অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের কবিতা-সংকলন) : প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫। প্রকাশক : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২।

১৩। **উদাত্ত ভারত** (শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন) : প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬ আগস্ট। প্রচ্ছদপট : অমূল্য দাশ। প্রকাশক : কাব্যলোক, ১ যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। দাম : ছয় টাকা।

১৪। **রক্তগোলাপ** (গদ্য-কবিতা সংকলন) : প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৫৮। প্রকাশক : বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, ২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম : আড়াই টাকা।

১৫। ১২ই ডিসেম্বর : কবির ৫০তম জন্মদিনে 'ট্রেড ইউনিয়ন' পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত। দাম : দশ আনা ও এক টাকা।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তিতে জনসংবর্ধনা

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের নিরলস ও সচেতন কাব্য-সাধনা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পরম গৌরবের বস্তু। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই সংগ্রামী কবি তাঁর কাব্যে জনজীবনের বৃহত্তর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনাকে রূপায়িত করেছেন। বাংলা কাব্যে তিনি নিঃসন্দেহে এক নূতন সুরের বাণী-কার। তাঁর কবিতার মধ্যে দেশ ও কালের এক সুগভীর প্রত্যয় নিয়ত প্রতি-ধ্বনিত। তিনি কবিতার সঙ্গে জীবনের ও জীবনের সঙ্গে এক মহৎ বিশ্বাসকে সংযুক্ত করেছেন। এই আশাভঙ্গ ও বিশ্বাসহীনতার যুগে বিমলচন্দ্র দীপশিখার মতো দীপ্যমান। বিমলচন্দ্র একাধারে প্রেমিক, বিপ্লবী, জীবনশিল্পী ও রূপ-কার। তাঁর কবিতায় অসামান্য মেধা ও মনীষা বিদ্যমান। তিনি নতুন পৃথিবী, নতুন চেতনা এবং আগামীকালের সত্যদ্রষ্টা, বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানচৈতন্যের কবি।

বিমলচন্দ্র দীর্ঘকাল থেকেই অসুস্থ। রোগাক্রান্ত হয়েও তিনি প্রাণের আগুনে প্রজ্জ্বলিত কবিতার শিখা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। এই উপলক্ষে কবির গুণগ্রাহী দেশবাসী ও পাঠকসাধারণের পক্ষ থেকে কবিকে জনসম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ও তাঁর চিকিৎসা-পথ্যের জন্যে একটি টাকার তোড়া অর্পণের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করি বাংলাদেশের কাব্যরসপিপাসু নাগরিকেরা এই আয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এবং সক্রিয় সাহায্য করে কবির কাব্য-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন। ইতি—১৭ই মাঘ ১৩৬৬ (স্বাক্ষর) : সর্বশ্রী—

রাজশেখর বসু
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
যামিনী রায়
অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
অন্নদাশঙ্কর রায়
লীলা রায়
আশাপূর্ণা দেবী
নীহাররঞ্জন রায়
শশিভূষণ দাশগুপ্ত
নীরেন্দ্রনাথ রায়
আবদুল হালিম
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণারঞ্জন বসু
নারায়ণ চৌধুরী
জ্যোতি বসু

কুমুদরঞ্জন মল্লিক
নরেন্দ্র দেব
রাধারাণী দেবী
কালিদাস রায়
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
নাগার্জুন (হিন্দী কবি)
অজিত দত্ত
হরপ্রসাদ মিত্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সমর সেন
মণীন্দ্র রায়
গোলাম কুদ্দুস
রামেন্দ্র দেশমুখ্য
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সুশীলকুমার গুপ্ত
সৈয়দ আবুল হুদা
হেমাঙ্গ বিশ্বাস
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সিদ্ধেশ্বর সেন
অমলেন্দু দত্ত

সোমনাথ লাহিড়ী	অমিয় ভট্টাচার্য
মহাদেবপ্রসাদ সাহা	নচিকেতা ভরদ্বাজ
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	কনক মুখোপাধ্যায়
বিনয় ঘোষ	দুর্গাদাস সরকার
নারায়ণ চৌধুরী	প্রফুল্ল রায়চৌধুরী
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়	সরোজ মুখোপাধ্যায়
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়
বিশু মুখোপাধ্যায়	দীনেশ চট্টোপাধ্যায়
ভবানী মুখোপাধ্যায়	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়	অরুণ রায়
অমরেন্দ্র ঘোষ	জ্যোৎস্না সিংহরায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়	ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
উমা মুখোপাধ্যায়	বিভুদান রায়চৌধুরী
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	সূর্য রায়
সন্তোষকুমার ঘোষ	অরুণ দাশগুপ্ত
সুকুমার মিত্র	কালিদাস মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	রঙ্গনাথ রাকেশ (হিন্দী কবি)
কুমারেশ ঘোষ	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ও

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষে
পৌরপ্রধান শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সহঃ সভাপতি**—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, সরোজ আচার্য, প্রাণতোষ ঘটক॥ **যুগ্ম সম্পাদক** : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু॥ **সহঃ সম্পাদক**—কৃষ্ণ ধর, আশিস সান্যাল ও তুষার চট্টোপাধ্যায়॥ **কোষাধ্যক্ষ** : কল্পনা ধর॥ **সদস্য** : আশা দেবী, সরোজকুমার দত্ত দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, ধনঞ্জয় দাস, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা চক্রবর্তী, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য সাঁই, সলিল নাগচৌধুরী, বিষ্ণু ভৌমিক, বিজন ঘোষ, অসীম সেনগুপ্ত।

॥ কবি-সংবর্ধনা ॥

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৯শে মার্চ শনিবার মহাবোধি সোসাইটি হলে আধুনিক বাংলা কাব্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথি কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবির অনুরাগী দেশবাসীগণের পক্ষ থেকে কবিকে একটি মানপত্র ও দুই হাজার পাঁচশত এক টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। কবিকে মাল্যভূষিত করা হয়।

সংবর্ধনা কমিটির অন্যতম সম্পাদক কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে কবির অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, এর কারণ কবি এ যুগের বলিষ্ঠ গণচেতনাকে তাঁর কাব্যে সার্থক রূপ দিয়েছেন। অপর সম্পাদক কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কবির অনুরাগীরা যে অর্থ প্রেরণ করেছেন তার হিসাব দেন।

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ বলেন, আমি আজ বৃদ্ধ বয়সে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে গৌরববোধ কচ্ছি। এই বয়সেও আমি কবি বিমলচন্দ্রের কবিতা পাঠ করে' প্রেরণা ও আনন্দ পাই। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লবের পরে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। গণ-চেতনায় উদ্দীপ্ত এক নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠে। বিমলচন্দ্রের কবিতায় এই নতুন গণ-চেতনা সার্থকরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বিমলচন্দ্র আমাদের দেশের একজন মহান কবি।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি বাংলা কাব্যে নতুন জীবনবোধ সঞ্চারিত করেছেন। তিনি নবজীবনের কবি।

হিন্দী কবি নাগার্জুন বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘকাল থেকে মহান কবি বিমলচন্দ্রের কবিতাবলীর সঙ্গে পরিচিত। তিনি 'নিরালা'র চেয়েও বড় কবি। গণচেতনা, প্রেমচেতনা ও দেশাত্মবোধ বিমলচন্দ্রের কবিতায় এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত। আমি বিমলচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হিন্দীতে তর্জমা কচ্ছি। নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মণীন্দ্র রায়, সাংবাদিক সুকুমার মিত্র প্রভৃতি কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানপত্র পাঠের পর বলেন, কলিকাতার আশী লক্ষ নরনারীর পৌর-প্রতিনিধি আমি, আশী লক্ষ নরনারীর কবি বিমলচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা মেয়রের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আমি সত্যই আজ গর্বিত ও আনন্দিত এই জন্যে যে, অমিত বীর্যবান ও নির্ভীক কবি বিমলচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই মহতী সভায় যোগদানের সুযোগ পেয়েছি। আমি আশা করি কবি সুস্থদেহে দীর্ঘকাল বাংলা কাব্যের মাধ্যমে দেশবাসীর চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবেন।

সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বাংলা কাব্যধারা ও বাঙালী জাতির অবিনশ্বর ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে, কবি বিমলচন্দ্র বাঙালীর মর্মবেদনাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি। নিপীড়িত ও শোষিত মানবতার জীবন-যন্ত্রণা ও আগামী দিনের সুস্থ

মানবসমাজের উজ্জ্বল আশাবাদে কবির কাব্য জনগণকে প্রেরণা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কবির সর্বজনপ্রশংসিত 'উদাত্ত ভারত' কাব্য-সংকলনের উল্লেখ করে বলেন যে, এই সুবৃহৎ কাব্য-সংকলনে বিষয়বৈচিত্র্য অপূর্ব! কবিতাগুলির বিস্ময়কর ছন্দচাতুর্য ও অমিত জীবন-দীপ্তি কবিপ্রতিভাকে স্মরণীয় করে রাখবে।

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় বিমলচন্দ্রের 'রক্তগোলাপ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'আমরা ভুলিনি' নামক কবিতাটি ও শ্রীসবিতাব্রত দত্ত কবির 'মুখোস' কবিতাটি আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করেন ও শিল্পী মন্টু ঘোষ কবির বিখ্যাত 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' গানটি গেয়ে শোনান। সভায় বহু স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কবির উদ্দেশে স্বরচিত ও কবির কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

পরিশেষে কবি তাঁর প্রতিভাষণে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেন, আপনারা জানেন যে আমি কোনো সংবর্ধনা চাইনি, সম্মানও চাইনি। যে দেশে আজো লক্ষ লক্ষ মানুষ অসম্মানিত জীবন যাপন করে, সে দেশে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্মানিত হওয়ার কোনো অধিকার নেই। আমি কৈশোর কাল থেকে যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজেছিলুম। দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পরেও প্রকৃত পথের দিশা খুঁজে পাইনি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ দেশপ্রেমিকদের প্রদর্শিত আদর্শে দীর্ঘকাল অবিচলিত থেকেও যে তিমিরে, সেই তিমিরেই সত্যানু-সন্ধানে মাথা খুঁড়ে মরেছি। সারা বাংলা, সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ ক'রে, আমি দেখেছি কোটি কোটি ভারতবাসীর বাস্তব জীবন। ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস এদের হাজার হাজার বছর কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারে নি। রুশিয়ায় সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লবের পর পৃথিবীর যুগযুগলাঞ্ছিত মানুষ প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছে। সেই আলোতেই আমি কবিতা লিখি। বক্তব্যই আমার কাব্যের প্রাণ। আমি কবি, আমি আমার দেশের কোটি কোটি নির্যাতীত জনগণের কণ্ঠস্বর। আমাকে যাঁরা 'সোচ্চার' ও 'উচ্চকণ্ঠ' বলেন, তাঁরা দুর্গত দেশবাসীর জীবন-যন্ত্রণা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারেন নি। তাছাড়া যাঁরা জাতীয় কাব্যধারার একটি মাত্র সুরকেই কাব্য আখ্যা দেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি বলেন, জাতীয় জীবনের অর্কেষ্ট্রা বাজে নানা বাদ্যযন্ত্র ও নানা সুরের সমন্বয়ে, বীণা ও বাঁশীর সঙ্গে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সমান মর্যাদা। কবি আরো একটি করুণ ট্র্যাজিডির কথা বলেন, সেটি হ'ল, যে দেশে একজন বিশিষ্ট কবি অক্লান্তভাবে তিরিশ বৎসর কাব্যসাধনা ক'রেও সপরি-বারে অর্ধাশনে জীবন ধারণ করেন, সে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা কী করুণ! কাব্য সাহিত্যের পণ্যমূল্য দেওয়ার ক্ষমতা দেশবাসীর নেই। তাই ব্যাধিগ্রস্ত কবিকে বৃত্তির জন্যে সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানাতে হয়, ভিক্ষুকের মতো গর্ণভিক্ষা নিতে হয়!! এই অভিশপ্ত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া ভারত-বর্ষের মুক্তি নেই। প্রতিভাষণের শেষাংশে কবি আবেগকম্পিত স্বরে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি পূর্বসূরীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। 'শতাব্দীকে অর্ধ-শতাব্দী' নামক রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠের পর কবি যখন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বক্তৃতা শেষ করেন তখন শ্রোতাদের মনে তাঁর আবেগাপ্লুত বাণী এক সুগভীর ও পবিত্র ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে।

ত্রুটি-স্বীকার : জনসংবর্ধনার আবেদনপত্রটিতে স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা থেকে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি আমাদের অনবধানতাবশতঃ বাদ গেছে, এর জন্যে আমরা দুঃখিত। —যুগ্ম-সম্পাদক

॥ মানপত্র ॥

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তিতে

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন

বন্ধু,

আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমরা আপনার দীর্ঘায়ু এবং আশু নিরাময় কামনা করি।

আধুনিক বাংলা কাব্যে আপনি এক সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বাঙালীর ভাবলোকে যে মুক্তবুদ্ধি নির্ভয় স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নি রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নিত্যদীপ্ত —আপনি সেই অগ্নিহোত্রে আসন গ্রহণ করেছেন। তাই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আপনিও একটি স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যায়।

অক্লান্ত আপনার প্রয়াস, অবিচলিত আপনার নিষ্ঠা। জীবনের দাবি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মুগ্ধ আত্মরতির বস্তু আপনি রচনা করেন নি। উদাত্ত চারণকণ্ঠ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন জনসাধারণের পাশে—দুর্দিনে তাদের অভয় দিয়েছেন,—সংকটে শক্তি দিয়েছেন,—সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের হাত থেকে মশাল নিয়েছেন আপনি—কিশোর কবি সুকান্তর মৃত্যু-সীমান্তকে প্রসারিত করছেন জীবন-দিগন্তের অভিমুখে। জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা আপনার কবিতায় বিমূর্ত। আপনি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ব্যাধিভারে আজ আপনি কাতর, নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে পীড়িত, তবু আপনার মানসশক্তি অপরাজিত—নির্ভীক লেখনী অশ্রান্ত। কোনো ভয়, কোনো স্বার্থ, কোনো প্রলোভন, আপনাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। তাই আপনি সমগ্র জাতির পক্ষে পরম বিস্ময় এবং অসীম শ্রদ্ধার বস্তু।

আজ আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষে আপনার অচিরাৎ রোগমুক্তির জন্য আমরা সম্মিলিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। অমিত বীর্যে, অদম্য নিষ্ঠায়, এবং অনত সত্যে আপনি সুদীর্ঘকাল আমাদের পরিচালিত করুন—আপনার কবিতা শান্তি, মুক্তি ও মানবতার সংগ্রামে বারে বারে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। ইতি—

॥ কলিকাতা ॥

২৯শে ফাল্গুন ১৮৮১ শকাব্দ

১৯শে মার্চ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ

আপনার অনুরাগী জনসাধারণের পক্ষে

শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার পৌরপ্রধান

কবির পঞ্চাশ পূর্তিতে শুভেচ্ছা, আশীর্বাণী ও অভিনন্দন

সত্যং পরং ধীমহি

শ্রীশ্রীনারায়ণোদেবঃ সর্বদা ভক্তবৎসলঃ।
স্বভক্তং বিমলং স্বান্তং পাতুশ্রীবিমলং সদা॥

২৮শে মাঘ ১৩৬৬ **শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ**
সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় ও মহাভারত কার্যালয় [মহামহোপাধ্যায়, পদ্মবিভূষণ]

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক বাংলার প্রধান কবিদের অন্যতম। তাঁহার কবি-প্রতিভা বহুমুখী, এবং তিনি বিভিন্ন বিষয়ের সার্থক ও সাবলীল অবতারণা দ্বারা আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বহুদিন হইতে কবি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত, এই হেতু বঙ্গ-সাহিত্যের যে সেবা তিনি করিতে পারিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে করা সম্ভবপর হইতেছে না। তথাপি কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার দানের মূল্য অনুভবী পাঠক এবং সাহিত্যামোদিগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মদিবস উপলক্ষে যে সংবর্ধনার ব্যবস্থা হইতেছে, আমি সানন্দে তাহাতে যোগদান করিতেছি এবং কামনা করিতেছি যে, কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ সুস্থ ও নিরাময় হইয়া বাঙালীর সেবা করুন এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি করুন। ইতি—১৬ই ফাল্গুন ১৩৬৬, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

*

ভাই বিমল,

মনের আকাশে আসুক নূতন
আলো আর আহ্লাদ
শত শরতের কমলগুচ্ছ
দিলাম আশীর্বাদ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

*

গত ১২ই ডিসেম্বর আপনি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন জেনে সুখী হলাম। আশা করি শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে সাহিত্য-সেবায় পূর্ণোদ্যমে যোগ দিতে পারবেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। ইতি—

নয়াদিল্লী **হুমায়ুন কবির**
১৭।১২।১৯৫৯

*

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আপনার দান স্মরণীয়। আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি রোগমুক্ত হ'য়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে আপনার স্বাতন্ত্র্যশীল সৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করুন—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই নিবেদন করি। ইতি—

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিগুণা সেন
কলিকাতা (রেক্টর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
২৫-২-১৯৬০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার জন্মদিন বার বার ঘুরে আসুক। পঞ্চাশপূর্তি উপলক্ষে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন। কবিত্ব দুর্লভ লোকে। আপনি সেই দুর্লভের অধিকারী। কি পেয়েছেন তাই মনে রাখবেন। আমার গৃহিণী বলেছেন, He has great originality. প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও শুভ কামনা।

শান্তিনিকেতন
১৭।১২।৫৯

ভবদীয়
অন্নদাশঙ্কর রায়

*

সম্বর্ধনা পাবার যোগ্যতা সকলের হয় না। যে দু'চারজনের হয় তাঁদেরও তা নেবার সাহস সঞ্চয় করতে হয়। কারণ সম্বর্ধনা ব্যাপারটা এক হিসাবে শাঁখের করাতের মত। তা'র একদিকে যেমন অনুরাগী ভক্তদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার চাক্ষুষ প্রমাণ, আর একদিকে তেমনি হিসেব চুকিয়ে সম্মানের সিকে-য় তুলে রাখবার প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতও বুঝি আছে। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সত্যকার সম্বর্ধনা অবশ্য প্রতি মুহূর্তে রসিক পাঠক, দ্রষ্টা ও শ্রোতার নীরব মুগ্ধ স্বীকৃতিতেই হয়; তবু ঘটা করে তার বাহ্যিক অনুষ্ঠান করবার সার্থকতাও নিশ্চয় আছে। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে সম্বর্ধনার আয়োজন হচ্ছে তা'তে তাঁর শক্তি ও সাহস সপ্রশংসভাবে স্বীকার করবার সুযোগ পেয়ে আমিও আনন্দিত। ইতি—

কলিকাতা
২৬-২-১৯৬০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

*

ঘরটি তোমার বন্ধ দুয়ার ভূতের বাসা আঁধার ঘেরা,
পঞ্চাশেও সেই আঁধারে ফুটছে মনের গোলাপ সেরা।
যদিই বা দিই তোমায় আমি গোলাপচারা পুঁততে টবে,
রুদ্ধ শ্বাসে মরবে জানি, তোমায় দিয়ে লাভ কি হবে?
ফুল বাগিচার গোলাপ আমার ফোটার পরেই শুকিয়ে ঝরে,
'রক্তগোলাপ' তোমার মনের গন্ধে ভুবন আকুল করে।

বোড়াল কৃষিশালা
১৩৬৬

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

*

॥ পরম শ্রদ্ধেয় কবিবর বিমলচন্দ্র ঘোষের প্রতি ॥

"আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি। বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী কবিদিগের আপনি অগ্রদূত। অনেক দুঃখ, ব্যাধি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আপনার সাহিত্য-সেবা আদর্শস্থানীয়।"

৪. মোহনচাঁদ রোড
কলিকাতা-২৩

ডাঃ নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি : কবিতীর্থ সাংস্কৃতিক পরিষদ

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। "স্বাধীনতা"র সঙ্গে আপনার লেখনীর নিবিড় একাত্মতাই আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সেতু রচনা করেছে। আপনার কবিতায় নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও জয়ের কথা ধ্বনিত হয়। আপনার লেখনী অমর হোক! আপনি দীর্ঘজীবী হোন। ইতি আপনার—

৫ই মার্চ ১৯৬০
কলিকাতা

সরোজ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : 'স্বাধীনতা'

*

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পঞ্চাশপূর্তি উপলক্ষে যে সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পেরে আমি দুঃখিত। বহুদিন আপনি রোগাক্রান্ত হয়ে রয়েছেন বলে জনসমক্ষে আপনাকে পূর্বের মতো দেখা যায় না। কিন্তু জনমানসে আপনার প্রতিষ্ঠা আজ সর্বস্বীকৃত। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আপনার অবদান যে মহার্ঘ, তা আপনার অগণিত গুণগ্রাহীর বর্তমান প্রচেষ্টাতে একান্ত স্পষ্টভাবে সূচিত হচ্ছে। ..আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার কবিতার দ্যুতি যেন দৈহিক গ্লানিকে অতিক্রম ক'রে আমাদের সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করতে থাকে। আপনার অনলস লেখনী থেকে এখনও অনেক রত্নের প্রত্যাশা দেশের রইল।

৭ই মার্চ ১৯৬০
নয়াদিল্লী

বিনীত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সংবর্ধনা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক সমীপেষু,

বাংলার জনপ্রিয় সংগ্রামী কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গুণগ্রাহী দেশবাসীর পক্ষ থেকে আপনারা আগামী ৫ই চৈত্র, শনিবার (১৯শে মার্চ) কবি-সম্বর্ধনার যে বিপুল আয়োজন করেছেন, জলপাইগুড়িবাসীর পক্ষ থেকে **'রূপায়ণ সাহিত্য সংস্থা'** দূর থেকে তাতে অংশ গ্রহণ করে কবিকে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপনের ও শ্রদ্ধার্ঘ প্রদানের এই মহান সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। এবং উপস্থিতির অসমর্থতায় সত্যিকারের দুঃখ জানাচ্ছে।

কবি রোগমুক্ত হোন, দীর্ঘজীবী হোন এবং সর্বোপরি তাঁর আজন্ম কাব্য সাধনা জয়যুক্ত হোক! কবির নবজীবনের শুভ-যাত্রাপথে এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। নমস্কারান্তে ইতি—

১৭ই মার্চ ১৯৬০
জলপাইগুড়ি

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়
সভাপতি : রূপায়ণ সাহিত্য সংস্থা

বিমলচন্দ্রাষ্টকম্

॥ নাগার্জুন ॥*

সত্যসন্ধায় কবয়ে
হততন্দ্রায় ধীমতে।
নমো বিমলচন্দ্রায়
মেঘমন্দ্রায় ভাস্বতে॥
লোকলক্ষ্মী বিলাসায়
লোকমানস শিল্পিনে।
লোকবাণী বরেণ্যায়
লোকমূলায় তে নমঃ॥
নমো দরিদ্রমিত্রায়
নমঃ পক্ষধরায় চ।
নমঃ সংঘর্ষশীলায়
নমস্তে ধূর্তশত্রবে॥
যস্যান্তর্জ্বলিয়া কাব্যে
বিক্ষোভো রসতাং গতঃ।
বিদগ্ধায় চ সিদ্ধায়
তস্মৈ সুকৃতিনে নমঃ॥

ছন্দাংসি যস্য ধাবন্তি
শব্দা যুদ্ধ্যন্তি পংক্তিশঃ।
তস্মৈ নমঃ সুকবয়ে
সংকল্পোজ্জ্বলচেতসে॥
দারিদ্র্যং পরমো ব্যাধিঃ
বিভেদঃ পরমো রিপুঃ।
পরমং দৈবতং লোক
ইতি বোধয়তে নমঃ॥
বিলাসব্যসনৈর্নদ্ধান্
বদ্ধান্ দুরিতরজ্জুভিঃ।
নমঃ তপস্বিনেতুভ্যং
ধনিকান্ অনুশাসতে॥
বিশ্বাত্মনে বিশ্বপীড়া
পুটপাকায় তে নমঃ।
নমো ভারতপুত্রায়
নমো বঙ্গবিভূতয়ে॥

* 'নাগার্জুন'—একজন স্বনামধন্য হিন্দী-কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৯১১ সাল। এ'র প্রকৃত নাম শ্রীবৈদ্যনাথ মিশ্র। ইনি 'যাত্রী' ছদ্মনামে মৈথিলীতে এবং 'নাগার্জুন' নামে হিন্দীতে সাহিত্য রচনা করেন।

অগ্নিগিরি

[শ্রীমান বিমলচন্দ্র ঘোষ স্নেহাস্পদেষু]

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ঘনিয়ে আসে বিদায় নেওয়ার দিন
যেতে যে চাই শোধ ক'রে ভাই সবার প্রীতির ঋণ।
ছন্দে গাঁথা কয়টি চরণ দিলাম তোমার হাতে,
সন্ধ্যামণির একমুঠো ফুল আঙট্ কলার পাতে।
তাহার সাথে রইলো আশীর্বাদ
স্থবির কবির গভীর প্রীতির সাধ।

সখের কবি নও তো তুমি, সুখের কবি নও,
সত্য তোমার আরাধ্যদেব তারি ধ্বজা বও।
কাঁটার বনে কাটালে কাল সারাটি জীবন
সকল কাঁটাই কুসুম হয়ে ফুটলো সুশোভন।

গিরির মতো উন্নতশিব, অগ্নিগিরি হলে,
হৃদয় তোমার লাভার মতো নামলো গ'লে গ'লে।
মূকের মুখে তুমিই দিলে ভাষা,
নিরাশ বুকে তুমিই দিলে আশা,
মোদের দিলে তপ সাধনার ধন,
কি দিব ভাই? দিলাম তোমায় স্নেহের আলিঙ্গন।

0000000 000000000000000000000000000000000000 00000000000